মৈত্রী সংযোগ সোসাইটি, কোচবিহার কর্তৃক
রূপান্তরকাম, যৌনতা ও অধিকার বিষয়ক উত্তরবঙ্গের প্রথম পত্রিকা উদ্যোগ

মৈত্রীবার্তা

দ্বিতীয় সংখ্যা | ২০১৬

সম্পাদকীয় | অরিন্দম দাস (ওরফে সুমি)

‘হাম লোগ সাথ সাথ হায়’

আজ মৈত্রীবার্তার সম্পাদকীয় লিখতে বসে ফিরে আসা দিনগুলো বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে। খুব মনে পড়ছে সেই সব দিন ২০০৯ সালে আমরা ঘুঘুমারীর ওই ছোট ঘরে কজন মিলে আলোচনা করেছি বার বার। আমরা প্রতি সপ্তাহে বসে আলোচনা করেছি কি করে আমরা কাজ করব কি কি পরিকল্পনা আমরা নিতে পারি। সেই আমাদের পথ চলা শুরু। তার পর হাতে গোনা সদস্য থেকে সেই সংখ্যাটি অনেক গুন বৃদ্ধি পেল। একটা সময়ের পর থেকে আমরা নানা সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করলাম এবং আমরা নানা নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম সেই সুত্র ধরেই বার বার মনে হয়েছে এলাকা ভিত্তিক এই কতি, হিজড়ে, ধুরানি যে নামেই ডাকা হোক না কেন এই সম্প্রদায়ের মানুষদের সামাজিক অবস্থান অর্থনৈতিক অবস্থানের বিস্তর ফারাক। আজ বড় শহরে এই সম্প্রদায়ের মানুষগুলো যে যে বৈষম্যর শিকার হয় সেই একইভাবে উত্তর বঙ্গের একটি গ্রামে দলিত পরিবারে জন্ম নেওয়া রূপান্তরকামী র উপর ঠিক সেই বৈষম্যর কার্যকর নয়। একজন প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত শিক্ষিত কতি, রূপান্তরকামী যে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে এর সাথে একজন গ্রামের দলিত পরিবারে জন্ম রূপান্তরকামীর সমস্যা কিন্তু এক নয়। আমার নিজের নানা অভিজ্ঞতার ফলে আমি মনে করি যে লিঙ্গ বৈষম্য, বর্ণ বৈষম্য কেও ছাপিয়ে যায় তথাকথিত আমাদের সমাজে ধনী গরিবের বৈষম্য। আমি এর আগেও নানা জায়গাতে বলেছিলাম আবারও বলছি কিছু উদাহরণ দিয়ে (নাম পরিবর্তিত)।

১) রতন একজন রূপন্তরকামী। তার জন্ম এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। পরিবারে তার মা, বাবা, দাদা, দিদি ইত্যাদি সবাই আছে। সে নিজে একটি হাতের কাজের সাথে যুক্ত যে মোটামুটি ভালো উপার্জন করে এবং তার নিজের দোকান আছে। পরিবার সুত্রে তার নানা মানুষজনের সাথে পরিচিতি খুব ভালো সে যে গ্রামে থাকে সেখানে তার অনেক জনের সাথে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে এবং নানাজনকে ও বাড়িতেও এনে রাখেছে এই বিষয়টি তার গ্রামের মানুষদের অজানা নয় তথাপি তার একটি সম্মান আছে সেই গ্রামে তার পরিবারের প্রতিপত্তি আছে সে জন্য সেটা ঢেকে রাখার একটা চেষ্টা চলে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু আর্থিকভাবে সচ্ছল তার পারিবারিক পরিচিতি অনেক ভালো তার সবর্ণ ঘরে জন্ম এই এত সব থাকবার জন্য তার যৌনতা এখানে কিন্তু মুখ্য বিষয় হয়নি সেটা সবার জানার পরেও রাখঢাক দিয়ে রাখার চেষ্টা।

২) সীমা একজন রূপান্তরকামী। তার জন্ম এক দলিত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে। তার পেশা যাত্রা পালা করা নারী বেশ ধারণ করে। সে তার একজন পুরুষ সঙ্গী নিয়ে তার বাড়িতেই বসবাস করত এতে তার বাড়ির বাবা, মা দাদা এদের কোন আপত্তি ছিল না সে কাজের সূত্রে বাইরে যেতো আবার মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরে আসত। একটা সময় পর লোকাল ক্লাবের রাজনৈতিক দলের মানুষজন তার বাড়িতে এসে সবাইকে শাষিয়ে যায় ও সীমার সাথে যে তার সঙ্গী ছিল তাকে মারধর করে সীমার উপর নানা রকম অত্যাচার করে শেষমেষ তাদের সম্পর্কটি আর থাকেনি। এখানে আমার দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু সীমা একজন দলিত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সেহেতু তার যৌনতা এখানে মুখ্য হয়ে গিয়েছে তার চলাফেরা সে কার সাথে থাকছে সেটা এখানে মুখ্য।

৩) রিন্টু একজন রূপন্তরকামী। তার জন্ম একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে। সে ছোট থেকেই দেখে এসেছে তার মা সকালে বাসাবাড়ির কাজে বেরিয়ে যায় সন্ধ্যে বেলায় ফেরে আর সে এবাড়ি ও বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় - তার বড় হয়ে ওঠা এভাবেই। একটা সময়ের পর সে নানা রকম অসৎ কাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। সে মনে করে তার জীবনটা নিয়তি নির্ভর সে এভাবেই কোনো দিন চলে যাবে আমাদের সবাইকে ছেড়ে। তার কাছে আন্দোলন ও অধিকার কথাটা নিতান্ত হাস্যকর।

উদাহরণ গুলোতে আমরা দেখতে পেলাম যে সামাজিক ও অর্থনীতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে সব ক্ষেত্রে যৌনতা বাধা হয়ে দাড়ায় না। সে সময় তার প্রতিপত্তি পরিচিতি এই সব মুখ্য হয়ে যায় যৌনতা সে সময় গৌন।

এবার বলা যাক উত্তর বঙ্গের রূপান্তরকামী আন্দোলনের শুরুর দিক নিয়ে : শিলিগুড়িতে প্রথম আন্দোলন শুরু হয় ২০০৪ সালে। শোনা যায় সে সময় কাজ করতে গিয়ে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেহেতু ছোট জায়গা কতি ধুরানি রূপান্তরকামী এই সব মানুষদের বেরিয়ে আসা খুব কঠিন ছিল হাতে গোনা কজন বেরিয়ে আসতে পেরেছিল কিন্তু একটা সময়ের পরে প্রচুর কতি, ধুরানি মানুষজন বেরিয়ে এসেছিল মানস বাংলার খোলা আকাশ মুক্ত মন জায়গাতে এসে তারা এক চরম শান্তি অনুভব করেছিল। এই কাজে বাদশা দা, বিউটি, লক্ষী এদের অবদান ভুলবার নয়। এর সাথে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন হিজড়ে খোলের কাজে জ্যোৎস্নাদি র অবদান উল্লেখ না করলেই নয় তিনি যে ভাবে হিজড়ে খোলের সবাইকে একত্রিত করেছিল সে সময় সত্যিই সেটা খুব বড় পাওয়া, আজ কিছুদিন হলো জোস্নাদি আমাদের সাথে নেই তিনি যেখানে থাকুন ভালো থাকুন।

দার্জিলিং এ কাজ শুরু হয় শিলিগুড়ি র পাশাপাশি সময় থেকে সেই সময় ঋতু, রুবি যে ভাবে দার্জিলিং এর মত একটি ছোট জায়গাতে অনেক কষ্টকর একজায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যাওয়া এতো বাধা সত্তেও তারা যেভাবে কতি, রূপান্তরকামীদের একত্রিত করেছিলো সেটা ভাবা যায় না। ... আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছি একবার কাজের সূত্রে দার্জিলিং গিয়েছি সেখানকার লোকাল গ্রুপ এর আয়োজনে একটি প্রোগ্রামে যোগ দিতে গিয়ে দেখি কোথা থেকে আসেনি মানুষজন কালিম্পং, কার্সিয়াং ,সিকিম নানা জায়গা থেকে রূপান্তকামীরা এসেছে আর প্রতিটা সরকারি স্তর থেকে মানুষজন উপস্থিত হয়েছেন টাউন হল লোকে গিজগিজ করছে সে এক মনে রাখার মত অভিজ্ঞতা আমার। এখন খুব কষ্ট হয় যে সেই যে একত্রিত একটি সংখ্যা আজ আর নেই ২০১২ সালের পর থেকে যে সময় তাদের একটি প্রকল্প উঠে গেলো অনেক কতি কর্মহীন হয়ে পড়ল তারপর নানা দিকে সবই ছড়িয়ে পড়ল কাজের খোজে। এখন ও ভাবি আবার বুঝি সে দিন দেখবো দার্জিলিং মেইল-এ কতিরা জমায়েত করছে শুধু দেখা যাচ্ছে রামধনু রঙ তার মাঝে ঋতু রুবি রা আবার ও হাসি মুখে বলে উঠছে হাম লোগ সাথ সাথ হায় অর সাথ সাথ রেহেঙ্গে।

ফালাকাটা আলিপুরদুয়ারে কাজ শুরু হয়েছে অনেক পরে একটা বিরাট সংখ্যক কতি, ধুরানিরা নিজেরা নিজেদের মত করে জায়গা তৈরী করে নিয়েছিল। তার বেশকিছু সময় পরে ২০০৯ তে কোচবিহারে কাজ শুরু হবার পর ফালাকাটা আলিপুরদুয়ার এর রূপান্তরকামী মানুষজন কোচবিহারে আসতে লাগল আমার কাজের অভিজ্ঞতাতে উত্তর বঙ্গের মানসিকতার দিক থেকে থেকে পিছিয়ে পরা জেলা কোচবিহার। শিলিগুড়িতে ২০০৪ সালে কাজ শুরু হলেও তার অনেকদিন পর্যন্ত শুধু মানুষজন কোচবিহারের কতি, ধুরানি সম্প্রদায়কে নিয়ে রাজনীতিই করে গিয়েছেন কাজটা কিছু হয়নি বিশাল ক্ষতি করে দিয়েছে, তবুও আশা রাখছি সবার মনে যে এই সম্প্রদায়কে নিয়ে ভুল ধারণা নানা ভাবে বৈষম্য এই সব বন্ধ হবে। যদি বলতে পারি আর যেন কোনো দলিত রূপান্তরকামি, কতি তার যৌনতার জন্য মার না খায়, আর যেন রিন্টুর মত কোনো কতিকে অসৎ পথে যেতে না হয়, আর যেন কোনো রূপান্তরকামীকে তার পোশাকের জন্য বাড়ি ভাড়া না পেয়ে সেল্টারে রাত কাটাতে না হয় ... যদি বলতে পারতাম আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।

এবার আসা যাক বহুচর্চিত বহু আলোচিত পশ্চিমবঙ্গ ট্রান্সজেণ্ডার ওয়েলফেয়ার বোর্ড প্রসঙ্গে। সর্বপ্রথম যে বোর্ড বিষয়ক মিটিং এর আয়োজন করেছিলেন নারী কল্যাণ দপ্তর সেই মিটিং এর কোনো খবর আমাদের জানা ছিল না এর পর নানা আলোচনা সভা হয়েছে কলকাতার নামকরা হটেলে সেখানে শুধু দক্ষিণ বঙ্গের মানুষজন এবং উত্তর বঙ্গে গ্লোবাল ফাণ্ড প্রাপ্ত সংগঠনগুলো ছাড়া আমাদের যোগদানের কোনো সূত্র ছিল না। আমরা ইমেইল চিঠি মারফত অনেক সময় নারী কল্যাণ দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও সফল হতে পারিনি। কিছুদিন পর দৈনিক একটি সংবাদপত্রে দেখা গিয়েছিল যে বোর্ড তৈরীর কাজ হয়ে গিয়েছে এবং তার কিছু পরে পরিস্কার হলো যে বোর্ড সদস্য ও সদস্যাদের নাম। খুব দুখঃজনক যে উত্তর বঙ্গে আমরা এবং দক্ষিন বঙ্গের দুএকটি সংগঠন ছাড়া এই অন্যায় এর প্রতিবাদ কেউ করেনি। আমরা বার বার বিভিন্ন সংবাদপত্রে বলেছি যে ব্যক্তিগত ভাবে বোর্ড এর সদস্য ও সদস্যাদের প্রতি আমাদের কোনো ক্ষোভ থাকবার কথা নয় আমরা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে জানতে চেয়েছি যেটা আমাদের কাছে পরিস্কার ছিল না। আমরা এখানেও দেখছি যে মানুষগুলো বোর্ডের সদস্য ও সদস্যা হয়েছেন তারা সবাই সবর্ণ এবং তারা সবাই যথেষ্ট প্রতিপত্তি ওয়ালা মানুষ তাদের সবার সামাজিক পরিচিতি রয়েছে, আমাদের প্রশ্ন এই যে তবে একজন দলিত নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের কথা কে বলবে উত্তর বঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামের দলিত রূপান্তরকামীর উপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারের কথা কি দক্ষিণ বঙ্গে বসে থাকা মানুষদের পক্ষে জানা বা বোঝা সম্ভব ? এই প্রশ্ন বার বার করেও উত্তর পাওয়া যায়নি আজও এই উত্তরের আশায় রয়েছি।

ঠিক-প্রেম-নয় | অভিজিৎ রায় চৌধুরী

১.

কিছু কিছু সময়ে বোকামিগুলো বোধহয় কিছু মানুষের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, মানুষ বোঝে সে ভুল করছে কিন্তু কিছু করার থাকে না, তাই আজ বেবির মৃত্যুকে আপন করে নিতে হচ্ছে। বেবি মানে পরিতোষকুমার রায়। রায় বংশের এক মাত্র সন্তান পরিতোষ, বাবা ক্ষীরোদ শেখর ছিলেন হাই কোর্টের নাম করা উকিল, পরিতোষ ছোট থেকে নিজেকে জাঁদরেল স্বভাবের বানানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মালে নাক উঁচু রাখার দায়িত্বটা পৈতৃক ভাবে চলতে থাকে, তবে পরিতোষ এই ব্যাপারে নাস্তানাবুত, তার কথায় কথায় কান্না পায়।

একবার স্কুল থেকে ফেরার পথে জুতো জোড়াটাও দিয়ে এসেছিল এক পথের শিশুকে, সেই দিনের মারের ব্যথা আজও পরিতোষ অনুভব করে তার পিঠে। কিছু ব্যথা কোন দিন কমে না বরং বারে। যেমন পরিতোষের ব্যথা ছিল শারীরিক, বেবির ব্যথা ছিল মানসিক।

২.

ক্ষীরোদশেখর কোর্টে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, মুখে মিষ্টি পানটা পুরে কোর্টের পকেট থেকে রুমাল বার করে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ীর দিকে। হঠাৎ পরিতোষের ঘরে চোখ পড়তেই নিজেকে অবশ মনে হতে লাগল।

সেটা যেটা দেখছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে, তার বছর ২২এর আদুরে ছেলে পরিতোষ, অবিকল মেয়ে সেজে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের আয়নার সামনে, এও কি সম্ভব ? সেদিন রায়বাবুদের মহলে জন্মেছিল এক পরিণত নারী, পরে নামই হয় বেবি। সেদিন কি সে জন্মেছিল ? নাকি সারাজীবনই সে ঘর করেছে পরিতোষ শরীরে ?

পরিতোষকে এখন মনবিদ্‌রা হয়ত বলবে পাগল, আর তান্ত্রিকরা বলবে আত্মা চেপেছে।

তবে ক্ষীরোদশেখর এসব কিছুই ভাবছে না, তার বুক ভারি হয়ে আসছে। আসলে বংশের দেমাগওয়ালা মানুষেরা বংশ পরিচয়ের বাইরে বেড়িয়ে ভালো বাবা হতে পারেনা কোনদিন। এরা পাগল ছেলে হলেও দূরে সরিয়ে রাখে পাছে লোকের কথা শুনতে হয়ে। বহু অনুরোধ করেও ক্ষীরোদশেখর তার ছেলের শরীর থেকে নিজে মৃত স্ত্রীর শাড়িটা খুলে নিতে পারেনা, বরং এক সময়ে অসহায় বাবা তাড়িয়ে দেয় ছেলেকে, পরিতোষ ঠান্ডা মাথায় বাবাকে 'আসছি' বলে বেড়িয়ে যায়।

৩.

সদ্য স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে পরিতোষ ভর্তি হয়েছে কলেজে, আইন তার বিষয়। কলেজের সিনিয়ররা ওকে রোজ হোস্টেলে উলঙ্গ করে মজা নিতো, অদ্ভুত জিনিষ মানুষকে মানসিক কষ্ট দিয়ে আনন্দ নেওয়ার মজাই আলাদা।

আমরা সবাই অন্যকে কষ্ট দিতে খুব মজা পাই, এটাকে কলেজে বলে র‍্যাগিং। প্রতিদিন বিনা পয়সায় ইজ্জতকে ধূলোয় মিশিয়ে নিজের ঘরে ফিরত পরিতোষ।

হোস্টেলের তাঁর রুমমেট এবং একমাত্র বন্ধু বিনয়, এইভাবে শুরু ওদের সম্পর্ক, বেবির আজও মনে পরে পরিতোষ আর বিনয়ের গোপন মিলনগুলো, সে বার ২ জনেই প্রচুর পরিমাণে পান করেছিল। মনে পড়েনা কখন কী ভাবে হয়ে যায় ব্যাপারটা। আস্তে আস্তে টান অনুভব করে ২জনের প্রতি শুরু হয় প্রেম।

তারপর চলে চুটিয়ে ভালবাসা,এই প্রেমগুলো প্রকাশ্যে বলা যায় না কেউ বলে একে নোংরামি, কেউ বলে প্রকৃতি বিরুদ্ধ, আবার কারো ধারণা বিদেশীয় বর্বরতা। যদিও পরিতোষ জানে এগুলি ঠিক না, কিন্তু তাও নিজের গোপন থেকে, বেড়িয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে পারেনা 'বিনয় তোকে ছাড়া আমি মরে যাবো'।

সমাজের চোখ রাঙানি বোধহয় কোনদিন যাবে না।

একদিন হস্টেলের বাকিরা সে খবর জানতে পারে এবং দুজনকে আচ্ছা করে মার দেওয়াও হয়। বিনয় সেদিন ঠিক করে, সে আর পড়বে না, একরাশ রাগ, ঘেন্না, আর ভয় নিয়ে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বেড়িয়ে যায়, আসলে বৃষ্টি শুধু আকাশ থেকেই পড়েনা।

৪.

সেদিন সকালে পরিতোষ ঘুমাচ্ছে, ঘুম ভাঙ্গে একটা ফোনে, দিনটা ১৪ই ফেব্রুয়ারি। বিনয় ফোন করেছে,

বিনয় - 'চিনতে পারছিস ?'

পরিতোষের হাসি পায় কথাটা শুনে, তাও তাঁর চোখ কেন ভিজে তা বলা মুশকিল। ভাঙ্গা গলায় ও বলে - 'বল কি হয়েছে ? হঠাৎ আমাকে মনে পরল ?'

বিনয় কি ভাবে বলবে বুঝতে পারছেনা - 'আমার বিয়ে রে আগামী মাসে। ৮ তারিখে'

পরিতোষের সমস্ত শরীরটাকে ঘেন্না হচ্ছে তাও নিজেকে সামলে বলে - 'কিন্তু !! কি করে এটা সম্ভব। তুই তো আমাকে ভালবাসতিস, তোর বাঁধবে না একটা মেয়ে সাথে শুতে ?'

বিনয় হয়েত কাঁদছে - 'পরি। আমি তোকে এখনও ভালোবাসি, কিন্তু তোকে নিয়ে বাড়িতে কি বলবো ? স্বার্থপরের মত নিজের কথা ভাবলে হবে না, মা বাবার কথা টাও তো ভাবতে হবে।'

পরিতোষ নিজেকে সামলাতে পারেনা -'আমি মেয়ে হলে পারবি আমাকে ভালবাসতে ? আমাকে নিয়ে ভাবতে তোর ঘেন্না করবেনা তো তখন ?'

বিনয় হতভম্ব হয়ে বলে - 'কি পাগলের মত কথা বলছিস পরি, আমি তোকে এমনিও ভালোবাসি'

পরিতোষ - 'তাও আমি তোর লজ্জার জায়গা, ভালবাসার নই' গোঙাতে গোঙাতে সে জানায় - আমি মেয়ে হব, কিন্তু তোকে পাওয়ার জন্য নয়।

তারপর আর ওদের কথা হয়েনি।

শহরের আলোতে রাঙানো হলদে আলোতে হয়ত আজও বেবিকে দেখব আমরা কোন ফুটপাথে, আমাদের দৃষ্টিতে থাকবে ঘৃনা,কোনদিন পরিতোষ বা বিনয়কে দেখে আমরা আবার অত্যাচার করব ওদের ভালবাসার জন্য,

কারণ ভালোবাসার জন্য অনেক মৃত্যু হলেও পৃথিবীতে ঘৃণার জন্য কাউকে মরতে হয়েনি।

অভিজিৎ রায় চৌধুরী পেশাগত দিক থেকে একজন শিল্পী ও আলোকচিত্র শিল্পী। আপাতত একটি উপন্যাস প্রকাশিতব্য

অন্যজন্ম : The Shadow of God's Light | ধী

আমি এবং ঈশ্বর :

ঈশ্বর এখানে হাঁটু গেড়ে বসে। অসহায়। শেষ নিশ্বাসের মতো পেলব। ধিক্কার জানাই তবুও। চোখে ঝলসে ওঠে 'আমি' এবং অনেক আমি'। গর্ভের মতো ধারণীয় ম্যাগমা ছুঁয়ে দিই। হে ঈশ্বর বুকের বা দিকে অস্তিত্বের জানান দিই আপনারই আমি।

'হামসিকে পারিক চিস্যা করে' আর তাই আপনাকে আর খুঁজি না। আঙ্গুল পুড়ে ক্ষত নামলে তৃতীয় লিঙ্গে আমিই আমার ঈশ্বর হয়ে উঠি।

রেল ও আমরা :

এবং তুমি কিংবা তোমরা যেমন গালি দিতে পারো অথবা সফিস্‌টিকেটেড খিস্তি, আমার শব্দ হয়ে যাওয়া মা, বাবা তুলে; যদিও ইতিহাস রাখিনি, আদতে যা হলদেটে পাতা; ভুলে গেছি কোমল স্নেহের স্পর্শ; যদিও রাস্তা চিনতে পারার ইচ্ছে হয় না তবুও মুখটা নিসপিস করে ওঠে - 'খোলপি দিয়ে টান্‌ডাবো।

হ্যাঁ এভাবেই তোমার নগ্ন সভ্যতার আঁকা মৃত রেলে রেখে যেতে পারি 'চোলহীন' 'হাততালি'।

হরিণ কিংবা আমি :

যদিও সবুজ বিছিয়ে লোহার গারদে ভালোরাখা, তবুও তলপেটে কি যেন জেগে ওঠে। থুথু ছিটিয়ে ভোর আসলে সূর্যের প্রথম আলো রঙা নরম হয়ে ওঠা হরিণটি শুধুই মাংসপিন্ড। শিকারিকে চেনা হয় না; তবুও তৃতীয় পথে খাদ্য-খাদ্যক সম্পর্কে আমি শুধুই 'হিজড়ে'।

তৃতীয় চোখে ত্রিবেণীর সংগম :

দেখছি নেমে ঠিক কতটা জল এ থই থই নিম্নগামী আন্দোলন। ঠিক কোন পথে ত্রিবেণী জন্ম নিতে চেয়ে বেভূলো পথে। ঘাতক কিংবা শয়তান ঈশ্বর স্বাপদীয় চলন-বলন ছেড়ে রাস্তায় নামো। মুর্হূতকালীন রক্তক্ষরনে আমরা শুধুই ভাসি। গন্তব্য নক্ষত্রের দেশ।

অনাবাদি স্পর্শে কাহারা মৃত মেঘ হয়ে ওঠে। আর আমি কিংবা আমরা মানুষ হয়ে উঠি। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নয়, শুধুই মানুষ।

ধী : শব্দে দিনযাপন। সামাজিক ঠিকানা - কুচবিহার। দেখা হবে কথা হবে শব্দে

হলদে গোলাপ : একটি স্বপ্নের দলিল | তন্ময় ভট্টাচার্য

কাহিনি শেষ হল। এক সময় তো শেষ করতেই হয়। রূপকথার গল্পের মত এবার যদি বলা যেত তারপর তাহারা পরম সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিল ... আহা। যদি বলা যেত ...’

না বলতে পারার সিন্দুক যখন উপচে পড়ে, ঘরময় ছড়িয়ে থাকে অবদমিত ইচ্ছার দিনলিপি, সেই মুহূর্তটিকে দেখতে বড়ো সাধ হয়। অসংখ্য স্বপ্নের মধ্যে দু’একটি ফুটে উঠলেই নিজেকে মনে হয় ‘সব পেয়েছি-র রাজা’। সেই রাজত্বের স্থায়িত্ব ঐতিহাসিকের বিষয় হোক, আমি শুধু জানি একটিই শব্দ - ‘আনন্দাশ্রু’। যার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে অনেক না পাওয়ার ক্ষতবিক্ষত মানুষ। মানুষ বলেই পারে ...

এই উপন্যাসটি ষাট বা সত্তরের দশকে প্রকাশিত হলে নিঃসন্দেহে অভিযুক্ত হত অশ্লীলতার দায়ে। সমরেশ বসুর ‘বিবর’, ‘প্রজাপতি’, বুদ্ধদেব বসুর ‘রাত ভরে বৃষ্টি’ কিংবা হাংরি সাহিত্যিকদের রচনার মতো। এবং অনেক টানাপোড়েনের পরও উপন্যাসটি অক্ষতভাবে জনসমক্ষে প্রকাশিত হতে পারত কিনা, সন্দেহ হয়। শোনা যায়, নব্বইয়ের দশকে গ্লোবালাইজেসনের যে ঝড় ওঠে, তাতে আর্ন্তজাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের রুচিবোধ পাল্টে ফেলতে গিয়ে বাঙালি হারিয়েছে অনেক কিছু। কিছুটা সত্যি। কিন্তু একইভাবে এটাও সত্যি যে, সেই ঝড় না উঠলে বাঙালির সহনশীলতা এতটাও ফ্লেক্সিবল হত না। এখনও হয়তো অনেকেই উপন্যাসটি পড়ে নাক কুঁচকাবেন, বিশেষত যাদের কৈশোর যৌবন ও তৎসংলগ্ন মূল্যবোধ তৈরি হয়ে গেছে নব্বইয়ের দশকের আগেই। কিন্তু আজ এই ২০১৫ সালে দাঁড়িয়ে ট্রান্সজেন্ডার অর্থাৎ রূপান্তরকামীদের নিয়ে লিখিত একটি উপন্যাস যেভাবে পাঠক সমাদৃত হচ্ছে এবং আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে, তাতে প্রথম প্রণাম প্রাপ্য সেই বাঙালি’রই। অবাক হয়ে ভাবছি, আমরা এত উদার হলাম কবে থেকে। নইলে যারা একটি নির্দিষ্ট বয়েস অতিক্রম না করলে সাধারণত বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্র পড়ারও অনুমতি পায় না বাড়ি থেকে, সেই মূল্যবোধের জায়গায় দাঁড়িয়েও (হোক না পরিণত বয়স) আপন করে নিচ্ছে একটি অজানা জগৎ। পুঁজিবাদী সভ্যতার চোখে যা নিষিদ্ধও বটে।

‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের একটি মাইলস্টোন। শিল্পী স্বপ্নময় চক্রবর্তী তার দগ্ধ কলম যেভাবে তুলে ধরেছে তথাকথিত আদর্শ সমাজের সমান্তরাল জীবনশৈলীর কাহিনী, তারপর মুগ্ধতা ছাড়া কোনো ভাষাই পড়ে থাকে না। জানার কৌতুহল মানুষের জন্মগত। আর সেই প্রবৃত্তিরই সার্থক রূপায়ন লেখকের আয়নায়। ‘এলজিবিটি’, অর্থাৎ ‘লেসবিয়ান-গে -বাইসেক্সুয়াল-ট্রান্সজেন্ডার’ গোষ্ঠীর সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ গোছের। ওপর-ওপর কয়েকটা মনগড়া ও প্রচলিত ধারণা আঁকড়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটানোর এই মানসিকতাটা যখন আহত হয়, একই সাথে খুলে যায় নতুন অনেককিছু জানার সুযোগ। আমরা অবাক চোখে দেখতে থাকি। অন্যের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে উন্নততর ভাবার ইগোটাও যেন কোথাও একটা ধাক্কা খায়। সারাজীবন অচ্ছুৎ ভেবে দূরে সরিয়ে রাখা সেই মানুষগুলোরও মন আছে, তারাও ভালোবাসতে পারে। হয়তো আমাদের থেকে কিছুটা তীব্রভাবেই। সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসা অনুভব করার মধ্যে যে মাধুর্য,তা তো বহু শতক আগে বৈষ্ণব কবি বলেই গেছেন - ‘প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর’। মেইনস্ট্রিম সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারাটা তাদের দোষ নয়। দোষ কারোরই নয়। বায়োলজিক্যাল বা মানসিকভাবে একটি মানুষ ‘এলজিবিটি’ গোত্রের হলেই যদি তাদের ‘একঘরে হতে হয়, এর থেকে দুর্ভাগ্যের কিছু হয় না। ‘যে আমাদের মতো নয়, সে-ই আলাদা - এই চিন্তাধারার হাঁড়িকাঠে বলি হওয়া মানুষের সংখ্যা কিছু কম নয় এই একবিংশ শতকে। সেইসব মানুষদের নিয়েই কলম ধরেছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী, তাদের মান-অভিমান- পছন্দ- চাহিদা- জীবন-পাওয়া- না-পাওয়া সবকিছুই অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন তিনি। ‘নিজে ঋদ্ধ না হলে অন্যকে সমৃদ্ধ করা যায় না’ - উপন্যাসটি পড়তে পড়তে এই বিশ্বাসই গড়ে উঠেছে আমার, আর বারবার নত হয়েছি লেখকের প্রতি ও ‘দেখে চিনতে না চাওয়া ’ সেই মানুষগুলোর প্রতি।

রোজকার জীবনে দেখতে দেখতে চলা হিজড়ে-সমকামী-রূপান্তরকামী’দের ক্ষেত্রে আমাদের যে আচরণ, তা প্রাচীনকালের অস্পৃশ্য’দের প্রতি ব্রাহ্মণদের আচরণের চেয়েও নিম্নস্তরের। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে নিজেই নিজের চোখে ছোটো হয়ে গেছি বারবার। মত ও পথের মিল না ঘটলেই দূরে ঠেলে দেওয়া আর কদ্দিন? ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’ - ভাবসম্প্রসারণ ও জ্ঞান দেয়ার পক্ষে আদর্শ পঙক্তি, কিন্তু মেনে চলার সময় বারবার পিছিয়ে আসি কেন? যৌনচিন্তা এক না হলেই একঘরে করে দেয়ার মধ্যে যে ‘লিঙ্গগৌরব’, তা একবিংশ শতাব্দী সহ্য করবে? তাহলে আমরা উন্নত কীসের? কীসের আধুনিকতা, কীসের গ্লোবালাইজেশ্ন? সোমনাথ থেকে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠার এই জার্নিতে প্রকাশ্যে তাঁকে যতজন সমর্থন জানিয়েছেন, আড়ালে ব্যঙ্গ করার লোকের সংখ্যা তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী। এবং এটি নিষ্ঠুর বাস্তব। তবু তাঁর লড়াই থামেনি। ট্রান্সজেন্ডার হয়েও বিশ্বের প্রথম কোনো কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, লিঙ্গপরিচয়ের থেকে শিক্ষার স্থান অনেক অনেক ওপরে। এখনও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ফর্মে লিঙ্গ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ‘মেল/ফিমেল ছাড়া কোন অপশান থাকে না। অথচ আমাদের দেশেই ‘এলজিবিটি’ গোত্রের মানুষের সংখ্যা এক কোটিরও বেশী, উপন্যাসটি পড়েই জেনেছি। তাহলে? অন্তরে এবং আচরণে নারীভাবাপন্ন হলেও শুধুমাত্র শারীরিক গঠনের জন্য কাউকে পুরুষের লাইনে ভোট দিতে দাঁড় করানো একটি তীব্র অপমান। আন্দোলন হয়, হবেও। আইন বানানো হবে, প্রতিবাদ হবে, পরিবর্তিত হবে। কিন্তু আদতে কি মানুষগুলোর কোনো উপকার হবে কি? নিজের দেশে মাথা তুলে বাঁচতে পারবে সেইসব সাধারণ (হ্যাঁ, সাধারণ বলছি সচেতনভাবেই) মানুষ?

এই প্রশ্নই বারবার উঠে এসেছে উপন্যাসটিতে। স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গের ছবিই প্রাণ পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মাইলস্টোন হয়ে থেকে যাবে এই উপন্যাসটি, যেখান থেকে মোড় নিতে বাধ্য হয়েছে বাঙালির তথাকথিত চিন্তা ও ধারণা। শহুরে পরিশীলিত কানে অনেক শব্দ, অশ্লীল লাগতে পারে, আপনার রামাবলি এঁটে গঙ্গাস্নানেও ছুটতে পারেন; কিন্তু বাবুমশাইরা,সাহিত্য যেখানে সময় ও সমাজের একটি নির্দিষ্ট অবদমিত অংশ তুলে ধরেছে, যারা যুগ যুগ ধরে মাথা নিচু করে থাকতে বাধ্য হয়েছে আপনাদেরই পায়ের নিচে, সেখানে তাদের ভাষ্য কাশীর কথকঠাকুরের ন্যায় আশা করাটা কি আকাসকুসুম নয়?

ভেবে দেখবেন। পড়ে দেখবেন। তারপর কথা হবে আবার ...

তন্ময় ভট্টাচার্য বেলঘরিয়া নিবাসী, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্র্যাজুয়েট কবিতা ও গদ্য লিখতে ভালবাসেন সবচেয়ে প্রিয় পরিচিতি পাঠক হিসেবে।

খোলা চিঠি | পিয়ালী

সবিনয় নিবেদন,

প্রথমেই বলে রাখি, এটা একটা আবেদনমূলক লেখা। ছোটবেলায় চিঠি লিখতে শেখার সময় আমরা যেভাবে ‘প্রণাম’ জানিয়ে শুরু করতাম, এখানেও তার বিকল্প করছি না। সকলের প্রতি সম্মান রেখেই শুরু করছি (খিক ! খিক !)।

প্রথমে ঘরই দিয়ে শুরু করি। (‘Safe zone’ কিনা)। বাড়ির কাছেই তো আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা, অথচ এই বাড়িই আমায় আমার গবেষণার কাজে খানিকটা হলেও বাধ শেধেছিল। গবেষণার জন্য মনযোগ দিয়ে যেদিন ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘চিত্রাঙ্গদা’ সিনেমাটি ল্যাপটপে চালিয়ে দেখছি, তুমি এসে বলে উঠলে, “একি সব সিনেমা দেখিস তুই। বেশ কয়েকদিন খেয়াল করছি তুই এই সব সিনেমা দেখছিস। কেমন ‘মেয়েদের মতো’ হাবভাব করে লোকটা।” শুনে খানিকক্ষণ চুপ মেরে গেলাম। বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না “তুমি কী করে এমন কথা বললে। যে কিনা আমার প্রতি বাবার নানান রেস্ট্রিকশনের প্রতিবাদ করেছ”। শুধু বলেছিলাম “রিসার্চের জন্য দেখতে হবে”। আর কিছু বলতে পারিনি। বোঝাতে পারিনি। তারপর থেকেই প্রায় লুকিয়েই বলা চলে, ইয়ারফোন কানে দিয়ে সিনেমাগুলো বারবার দেখেছি। কখনো রাতে তোমরা সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পর এভাবেই আলো নিভিয়ে দেখেছি। যাতে তোমাদের মনে হয় আমি ঘুমছি। এই চিঠি তোমায়। তোমার মতো আরো অনেক মা-র জন্য, যারা ছেলে মেয়েদের ‘বড়ো’ হওয়ার স্বপ্ন দেখো; দাবী করো তোমাদের sacrifice, compromise - এর জন্যই আমরা কীনা ‘বড়’ হয়েছি। একেবারেই অস্বীকার করছিনা। তবে যদি আর একটু সহযোগীতা করতে, তাহলে আর লুকিয়ে লুকিয়ে ‘চোরের মতো চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়বোধ কাঁধে নিয়ে এগোতে হত না; আর একটু ‘বড়’ হয়তো হতে পারতাম।

এবার আসি পথচলতি ‘দাদা-ভাই’-দের কাছে। আপনি, হ্যাঁ আপনি। আরে মশাই আপনার দিকেই তো আঙ্গুল দেখাচ্ছি, আপনি বুঝতে পারছেন না? বুঝবেন-ই বা কী করে? বুঝলে কী আর আজ আমাদের এই দিন দেখতে হয়? এখনো পারছেন না? আশ্চর্য্য! এবার কী তাহলে আপনার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবো? I am sure– এবার আপনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন। Thank God। বাঁচালেন। এবার মন দিয়ে শুনুন। মনে পড়ে সেদিন ফোর্ট উইলিয়ামের সামনে বাসটা যখন ট্রাফিকে আটকে, আপনি, হ্যাঁ আপনি বাসে বসে দল বেঁধে ‘সিগনালে মেয়ে সেজে চাঁদা তোলা হিজড়েদের’ কেমন ‘কোতি কোতি’ করে চিৎকার করছিলেন, আর আমি ভয়ে/সঙ্কোচে (অনুভুতিটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি) গাছের আড়াল নিচ্ছিলাম; কিংবা Status Maintain করতে গিয়ে ট্যাক্সি/গাড়ির কাঁচটি তুলে মনের সুখে কটা ‘খিস্তি’ মেরে আমায় ফালাফালা করছিলেন, ট্রেনে হঠাৎই ঘুমের ভান করে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন,

আর যেই আমি এগিয়ে গেলাম ওমনি আপনার ঝুড়িতে থাকা সব অভিজ্ঞতা পন্ডিতের মত পাশে থাকা বাকিদের বলতে শুরু করলেন (অবশ্যই জ্ঞান বিতরণের শুরুতে কটা খিস্তি ছিল), আপনাদের বলছি একবারো কি ভেবে দেখেছেন কেন আজ এভাবে ‘চড়া সাজে’ আমাদের রাস্তায় ঘুরে টাকা collect করতে হয়? দয়া না, আমরা সহযোগিতা চাই। সংবিধানে সকলের সম্মানের সাথে বাঁচার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে কেন আমাদের অধিকার নিয়ে এভাবে টানাটানি চলছে? সংবিধানে যে এও বলা আছে, অধিকার ক্ষুন্ন করা হলেই আইনের চোখে তারা অপরাধী। আমার একান্ত ব্যাক্তিগত একটা চাওয়া (সাংবিধানিক বিধি লঙ্ঘন না করে) নিয়ে যদি আমি ‘Criminal’ হয়ে যাই, তাহলে আপনি কীভাবে এখনো বুক ফুলিয়ে (চিতিয়ে) ঘুরে বেড়াচ্ছেন? জন্মের পর থেকেই যে আমি বাড়ি, আত্মীয়, পাড়া, স্কুলে হিংসার শিকার হয়েছি, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি, সে কাজ পাবে কোথা থেকে? তার উপর আমরা ‘ভিন গ্রহের প্রাণী’ যাদের আপনারা দুচোখ দিয়ে প্রাণ ভরে দেখে যান আর মনে প্রাণে আমাদের গুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়েন। আপনি, হ্যাঁ আপনারাই আমাদের এই অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। অথচ কেমন ‘ভদ্রলোক’ সেজে দুবেলা আমাদের গায়ে থুথু ছিটিয়ে সাধু বেনে বসে আছেন। আমরা যদি একটা ‘অপরাধ’ এর জন্য অপরাধী হয়ে থাকি, একবার হিসেব করে দেখুন তো ঠিক কতগুলো ‘অপরাধ’ আপনি করেছেন।

এবার আসি প্রশাসনের দিকে। যদিও এর জন্ম দিয়ে লালন-পালন করে আমরাই ‘বড়’ করেছি, সেই প্রশাসনও কিনা দাগাবাজি করছে। Basic অধিকারটাও যে আমরা পাচ্ছিনা। পাচ্ছিনা কথাটা কেমন যেন ক্ষমা ক্ষমা শোনাচ্ছে না? হ্যাঁ, এখনো ক্ষমা করেই চলেছি। যেদিন এই ‘ক্ষমা’ বিষয়টা আমরা ভুলতে বাধ্য হব, সেদিন দেখি কেমন ‘সাইড’ নিতে পারেন। কানে এসেছিল, দক্ষিণ ভারতে নাকি ট্রান্সজেন্ডারদের ট্রাফিক সিস্টেমে সহকারী হিসাবে নিয়োগ করা হবে, পশ্চিমবঙ্গেও তাই। তবে আজো কেন আমরা রাস্তার মোড়ে ট্রাফিকে আটকে থাকা লোকের ঘৃনা ভরা চোখের শিকার হই? কেন অন্ধকার গলিতে যাতায়াতের সময় আমাদের কাপড় নিয়ে টানাটানি করা হয়? কেন আমাদের যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়? কেন আমরাও আর পাঁচটা মানুষের মতো নিরাপদভাবে দিন যাপন করতে পারছিনা? কেন আমাদের উপর হওয়া হিংসার অভিযোগ থানায় লেখা হয় না? কেন আমাদের একজনকে বছর খানেক আগে বর্ধমানে ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ছুড়ে ফেলা হল? কেন তারপর সরকারি হাসপাতালে তার জৈবিক লিঙ্গ নিয়ে দ্বিধাগত টানাপোড়েনের জেরে বিনা চিকিৎসায় মরে যেতে হল? কেন আমরা আমাদের প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি? দেশের কোথাও নারীরা নিরাপদ নন, তাদের নিরাপত্তা নিয়ে নানান আলোচনা, জমায়েত, প্রতিবাদ মিছিল হয়ে চলেছে প্রায় রোজই। থিকথিক করা ভীড়েও নিজেকে সেই প্রতিবাদের অংশ করে তুলতে যথারীতি প্রতিযোগিতা চলে। কতশত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রহরী রাখার ব্যবস্থা চলে। আর আমাদের জন্য কারা আছেন,তা নিশ্চয়ই আর বলার প্রয়োজন পড়ে না। প্রশাসন বলে কথা। আপনাদের যে ‘সবদিকে’ (ব্রাত্য আমরা কজন) নজর। আমরাও যে এই সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতির অংশ। এই একচোখোমি বন্ধ করে একটু কাজ করুন দেখি। আমাদের জন্য আলাদা করে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী করছিনা, আমাদের অধিকার রক্ষার দায় আপনার, সেটাই শুধু মনে করিয়ে দিলাম।

এই হয়েছে আর একটা জায়গা, আমাদের মাথা খেয়ে বসে আছে। আর আমরাও তেমন বোদ্ধা সেজে কিছু না বুঝে, কিংবা বুঝেই সবটা গোগ্রাসে গিলছি। একবারো আমরা প্রশ্ন তুলছি না কেন আমাদের এভাবে প্রোজেক্ট করা হচ্ছে। মেইনস্ট্রিম সিনেমায় এমনিতেই আমরা প্রধান চরিত্রে তেমন জায়গা পাইনি। আর যে সকল সিনেমায় আমরা আছি, সেখানে নিছকই হাস্যরসাত্মক কোন চরিত্র, কিংবা কখনো গানে অহেতুক আমাদের উপস্থিতি (যেমন, বিখ্যাত বলিউড চলচ্চিত্র ‘লাওয়ারিশ’-এর একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গীত ‘জিসকি বিবি মোটি উসকা ভি বড়া নাম হ্যায়....” এর একটি দৃশ্যে বৃহন্নলাদের দেখা যায়। এবং সেক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ও নিছকই হাস্যরসাত্মকভাবে এদের এখানে ব্যবহার করা হয়েছে)। যেন আমরা ছাড়া সিনেমাটি দাঁড় করানো যাচ্ছিল না। মেকাপ আর্টিস্ট, ফ্যাশন ডিজাইনার - ছাড়া আমাদের দেখানো হয় না। সত্যিই কী আমরা শুধুমাত্র এই কাজগুলোই করে থাকি? সবচেয়ে খারাপ লাগার বিষয়টি হল, আমরা যেন কোনভাবেই এই সমাজে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার যোগ্য নই। মহেশ ভাটের ‘তামান্না’ সিনেমায় এতো যত্নে বড় করা তামান্না কি না শেষে কিক্কুকে অসম্মান করার সাথে সাথে তাকে ত্যাগ করল। তার মানে কী এভাবেই আমাদের বলে দেওয়া হচ্ছে, ‘তোমরা সন্তান সুখ পেতে পারো না। তোমাদের সেই অধিকার নেই’? আমরা যারা নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়ে রূপান্তরিত হয়েছি,তাদের কী এভাবে বঞ্চনার শিকার হওয়াই স্বাভাবিক? তাই কী ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘চিত্রাঙ্গদা’য় ওভাবে পার্থ রুদ্রকে ছেড়ে চলে গেল। ‘প্রকৃতি বিরুদ্ধ’ আচরণের জন্যই কী আমাদের এটা প্রাপ্য? মাননীয় চিত্র পরিচালক, আপনিও কী একবারও ভেবে দেখবেন না আদপে ‘প্রকৃতি বিরুদ্ধ’ ব্যাপারটা ঠিক কী? আপনারা যে আমাদের মেন্টর, পথ প্রদর্শক, কালচার গড়ার কারিগর। তা ঠিক, কালচারই তো গড়ছেন,যে কালচারের যাঁতাকলে আমরা প্রতিনিয়ত পিষে যাচ্ছি, সেই কালচারের পৃষ্ঠপোষক তো আপনারাই। একটা কথা বলতেই ভুলে গেছি, শুধু উপস্থিত মতাদর্শকে শক্তিশালী করে তোলাই নয়, নতুন মতাদর্শ তৈরিতেও আপনাদের জুড়ি মেলা ভার। যার ফলস্বরূপ আমরা বুঝে উঠতেই পারছিনা, ঠিক কী হচ্ছে। আমাদের নিয়ে অন্তত কাজ হচ্ছে এই ভেবে উল্লাস করছি। এই মতাদর্শ তৈরি করাও কী চারটিখানি কথা। তবে বলি কি, আর কতদিন আমাদের এই মায়াজালে আবদ্ধ করে রাখবেন? কতদিন আমরা অজান্তেই নিজেদের পণ্য হতে দিয়ে উল্লাস কবর? ব্যবসায়িক সাফল্য নিয়ে আমাদের কোন হিংসা নেই, তবে দয়া করে আমাদের নিয়ে খেলাটা এবার থামান।

সব শেষে বলি, মেজাজ না হারিয়ে চিঠিটা সম্পূর্ণ পাঠের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই রে! কথাটা শুনে রাগ আরো বেড়ে গেল? মনে হচ্ছে সামনে পেলে এক্ষুনি উচিৎ শিক্ষা দিতেন? তবে বলি, আপাতত সে ইচ্ছেটি তাকে তুলে রাখুন, পরে না হয় সাক্ষাতে সৌজন্য বিনিময়টা সেরে ফেলব। আর এখন ইচ্ছে হলে লেখাটি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে পারেন। অথবা যদি ভীষণ রাগ হয়, কাগজটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলতেও পারেন, আর যদি তাতেও রাগ না কমে শুভাকাঙ্খী হিসাবে একটা সাজেশ্ন দিতে বড্ড ইচ্ছে করছে, বিশ্বাস করুন ভীষণ কার্যকরী। লিখে ফেলুন। গুছিয়ে পালটা জবাব দিন, মনের জ্বালা খানিকটা হলেও জুড়োবে। করে দেখতে পারেন, আমি তো ভীষণ ফল পেয়েছি। তা আপনি এখন যাই করুন না কেন, আমার কাজ কিন্তু আমি ষোলো আনাই উসুল করে নিয়েছি। ভাবছেন হয়তো কে এই হরিদাস পাল? এই যে আমার পরিচয়।

ইতি

পিয়ালী

রচনার উল্লেখিত কোন চরিত্রের সাথে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কোন সর্ম্পক নেই। সবটাই প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা প্রসুত।

লেখক কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র থেকে এম. ফিল করেছেন। বর্তমানে ইন্ডিপেনডেন্ট রিসার্চার। গবেষণার ক্ষেত্র - জেন্ডার সেক্সুয়ালিটি স্টাডিস, মানবীবিদ্যা, কালচারাল স্টাডিস, ভিসুয়াল রেপ্রেসেন্টেশন।

অন্ধকারের উৎস | লিওনিড দত্ত

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগ থেকেই, সেই যেদিন পৃথিবীর বুকে ধ্বনিত হল সৃষ্টির প্রথম শঙ্খনিনাদ, তখন থেকেই ‘লিঙ্গ’ কথাটির বীজ রোপন শুরু হয়েছে। নানান জনের নানান মত ও নানা বিধি নিষেধের মধ্যে তাই ছোটবেলায় আমাদের শিক্ষকরা নারী-পুরুষ কিংবা পুং-স্ত্রী পড়িয়ে তৃতীয় লিঙ্গ শব্দটিকেই খুব সচেতন ভাবে এড়িয়ে গেছেন। অথচ এই ট্রান্সজেন্ডার এর অস্তিত্ব তো আজ নয়। আদি থেকেই এর বিরাজ। কিন্তু চিরকাল এদের নীচে ফেলে রেখেছি আমরা। ‘অপয়া’ অভিবাদন করেছি, অথচ বাড়িতে সন্তান হলে এদেরই ডেকে আশীর্বাদ নিয়েছি।

অথচ চিত্র কি চিরকালই এমন? বহু রাজপ্রাসাদে রাণীর অন্দরমহলে সিকিউরিটি হিসাবে নিযুক্ত হতো। যদিও মহাভারতে এদের যুদ্ধের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, তবু অন্দরমহলে এদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তারা অবশ্য প্রকৃত অর্থে ‘হিজড়া’ শ্রেণীভুক্ত হতো। অর্থাৎ তাদের দেহে নারী-পুরুষ উভয়ের যৌনঙ্গ উপস্থিত।

আবার এই ‘ট্রান্সজেন্ডার’ শ্রেণীভুক্ত আরেক গোষ্ঠী উপস্থিত যাদের শরীর ও মনের মধ্যে অদ্ভুত ফারাক উপস্থিত।

শারীরিক ভাবে তারা পুরুষ হলেও মন নারীর অথবা তারা শারীরিক ভাবে নারী হলেও মন পুরুষের। এদের রূপান্তরকামী বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ এদের মানসিক লিঙ্গ আর আরোপিত লিঙ্গের মধ্যে বিস্তর ফারাক। সেরকম ভাবেই তারা ঈশ্বরের সৃষ্টি। বহু ক্ষেত্রে অবশ্য এদের ‘অস্বাভাবিক’ বলে দাবী করা হয়। তবে, পৃথিবীতে যা নিয়ত ঘটে তাই স্বাভাবিক আর বাকিরা ‘অস্বাভাবিক’ এমন ধারনা পোষণ করা উচিত নয়। সেরকমভাবে দেখলে ভারতে প্রতি দেড় মিনিটে যখন একটি মেয়ে ধর্ষিত হয়, তখন তাকেও স্বাভাবিক বলে ধরতে হয়।

কিংবা ‘সমকাম’ (যদিও ‘সমপ্রেম’ কথাটি অধিকতর সঠিক) শুনেই আমরা নাক সিটকাই। অথচ এসব নিয়ে ভাবার চেষ্টা করেছি কী কখনও?

ভাষার লিঙ্গের অধিকার: ভাষার লিঙ্গ নিয়ে দ্বন্ধটা চিরকালের। এখন প্রশ্ন হল সমস্যাটা কোথায়? বেশ তো চলছে ভাষা। চলুক না।

সমস্যা বেশ কিছু শব্দ ও তার প্রয়োগ নিয়ে। কিছু শব্দ স্ত্রী বাচক ও কিছু শব্দ পুং বাচক। কিন্তু আমাদের সমাজে আরও এক তৃতীয় লিঙ্গের ঈশ্বর সৃষ্ট জীব বাস করে। তারাও মানুষ। তারা তো সমাজের বাইরে নয়। তাহলে তারা ’ he’ না ’she’? কোনটা ব্যবহার করব তাদের ক্ষেত্রে ?

তাদেরও কিন্তু তাদের ভাষার উপর ততটাই অধিকার যতটা আমার-আপনার এবং আরও পাঁচ জনের।

বাংলা ভাষার অবশ্য 'সে' বা 'তারা' কথাটি সবার জন্য। কিন্তু যদি কোনও ট্রান্সজেন্ডার আমার professor হন, তাহলে তাকে কী বলব? অধ্যাপক না অধ্যাপিকা।

আবার অন্যান্য ভাষার মধ্যে স্পানিশ ভাষায় একসাথে স্ত্রী-পুরুষ থাকলে সেই গ্রুপকে পুংলিঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এও সেই চিরাচরিত পুরুষতন্ত্রের চাটুকারিতা। তাহলে সংখ্যালঘু বলে কী এরা ভাষায় সম্বোধিত হবার অধিকার হারিয়েছে?

ইংরাজীতে "Mr" অথবা "Mrs" এর পরিবর্তে একটি খুব সুন্দর কথা ব্যবহৃত হয় "Mx" যেখানে ব্যক্তিটি তার লিঙ্গ প্রকাশে বাধ্য নয়। এটিও ব্যবহার হতে পারে ট্রান্সজেন্ডারদের জন্যে।

যৌনতার অধিকার: যৌনতা একটি আদিম প্রক্রিয়া। দীর্ঘ যুগ ধরে এর উপর শিল্পের ঝান্ডা পুঁতে রেখে ঢেকে রেখেছি। ঠিক যেমন বৌদ্ধ মনাষ্ট্রিতে ধ্যানরত বুদ্ধের শরীরে লেপ্টে থাকা নগ্ননারীর চিত্রকে পর্দা দিয়ে আড়াল করে রাখা হয় অথচ আমরা সেখানে গেলে পর্দা সরিয়ে সেগুলিই আগে দেখতে চাই অদম্য কৌতুহলে, ঠিক তেমনিই বিদ্যালয়ে সেক্স এডুকেশন না পেয়ে নানান ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে যৌনতার পর্দা তারা সরাতে চায় বয়ঃসন্ধির সময়। এর ফলে তারা বন্ধু বা অল্প বড় দাদাদের কাছ থেকে শুনে লাভ করা জ্ঞানের ভিত্তিতে নানান ভুল সিদ্ধান্তে আসে। লুকিয়ে অনামী সেন্টার থেকে অ্যাবরশন করাতে গিয়ে বহু জটিলতার সৃষ্টি হয়। এতে তারা ধীরে ধীরে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, প্রাপ্তমনস্ক হয় না। তাই মানসিকতার প্রভাবের ফলে আমরা বন্ধুদের অপমান করতে অনেক সময় 'হিজড়া' বলে সম্বোধন করি, 'মেয়েলি' বলেও করি। অথচ পৌরুষ বস্তুতার সত্যিই কোনও দরকার নেই। যদি কিছুর দরকার থাকে, সেটা মনুষ্যত্বের। তাই ছোট থেকে তাদের যৌনতার জ্ঞান অধিকার নিয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। তাদের বুঝতে হবে যৌনতা নিয়ে কোন মানুষকে ছোট করার মধ্যে কোনও বীরত্ব নেই। কোন বীরত্ব নেই কারোর যৌনতার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলার। একজন বারবণিতারও ততটাই সম্মান পাবার অধিকার আছে যতটা আছে আমার এবং তোমার। প্রত্যেক ট্রান্সজেন্ডারের ততটাই সম্মান নিয়ে সমাজে বাঁচার অধিকার আছে যতটা বাকীদের।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিছু নারীর এবং কিছু পুরুষের গুণ বর্তমান। তাই রাষ্ট্রের কী অধিকার আছে কারও উপর তকমা লাগানোর, যে সে কাকে ভালোবাসবে?

কেমন আছে তারা?

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দলবদ্ধভাবে কাজ করতে গেলে এরকম বলেই থাকি 'ওকে নিস না, ও তো মেয়েলি'। যেন সমাজের এই গোষ্ঠীর মানুষরা কোনও কাজে লাগে না, সব কাজ করে নামের পাশে 'সুপার ডুড' লাগানো ছেলেরা। অথচ বহু ক্ষেত্রে এই ট্রান্সজেন্ডার গোত্রের মানুষেরা তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন।

তা সত্ত্বেও এদের চিরকাল গঞ্জনা অপমান সহ্য করে যেতে হয়। নিজের বাড়িতে স্থান হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। বাড়ি ফিরে বাড়িওয়ালার বাঁকা দৃষ্টি দেখতে হয়। পাড়ার মোড়ের ছেলেদের তার শরীর নিয়ে অদম্য কৌতুহল মাঝে মাঝেই জানলার ঢিল বা অনাকাঙ্খিত উৎপাতে পরিণত হয়। উৎসবে অনুষ্ঠানে ব্রাত্য থাকে এরা। সামাজিক প্রতিষ্ঠা না পেয়ে পেয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ তাই এদের সর্বাঙ্গে। বাধ্য হয়ে তাই ট্রেনে বা সিগন্যালের মোড়ে দাঁড়াতে হয় এদের।

এদের সামাজিক ভাবে স্বীকৃতি দিলে কী আমাদের খুব ক্ষতি হবে? মানুষ হিসাবে যে নূন্যতম সম্মান তাদের প্রাপ্য, তা দাবি করাও কি তাদের অন্যায়?

লিওনিড দত্ত ছোট থেকেই লেখালেখির সাথে জড়িত। বর্তমানে VIT University তে পাঠরত। জন্ম ও বেড়ে ওঠা বর্ধমানে। বর্ধমান পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র।

কবিতা

বেঁচে আছি তাই | শুভ্রজ্যোতি বর্মন

১

একলা ঘরে অসহায় রুদ্ধী
এও কি দুঃখ নয়?
মাইলের দর মাইল দূরে সরে যাচ্ছি।
এও কি দূরত্ব নয়?
রক্ত সাদা হয়ে জলে ভাসছে,
এও কি কাঁপন নয়?
মনে একই রকম প্যানপ্যানানি
এও কি অসহয়তা নয়?
দিন নেই রাত নেই নিশাচরী কান্না।
একেও মৃত্যু বলব না!

২

খুব গোপনে গোপনে আছি,
পৃথিবীকে একটুও বুঝতে না দিয়ে।
ধূসর বিকেলে কুল কিনারা হারিয়ে-

খুব ভয়ে ভয়ে আছি,
হিম শীতের মত খুব বড়সড় হয়ে।
বেঁচে আছি জীবনকে না পেয়ে -

খুব কুঁকড়ে কুঁকড়ে আছি,
দম বন্ধ অন্ধকারে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে।
অসহায় পৃথিবীর মদ মাংসের ভয়ে -

৩

মৃত্যু যখন আদর করে ঘুম পাড়াবে আমায়,
চন্দন টিপের আল্পনা এঁকে দেবে মাথায়,
ঠোঁট ভেজাবে তুলসী গাছের পাতায়,
তখন ... একটু সবুর ... একটু অপেক্ষা
পৃথিবীর শেষ রাস্তার মোরে
আলো জ্বেলে যাব শেষ শুয়ে পড়ার আগে।

৪

যতগুলি হারিয়েছি রং - পেন্সিল-তুলি
যতবার খুইয়েছি সম্পর্কগুলি
যতখানি হারিয়েছি দুঃখ-সুখ
যতগুলি ভুলেছি ছেলেবেলার মুখ
সময়ের ফোকরে পানসে যতখানি শূণ্য
যতবার হয়েছি ফালু অপদার্থ বলে গণ্য
যতবার শুনেছি অযোগ্য বুদ্ধিহীন নগন্য
ততবার ততগুলি ততখানি আনন্দ যেনো থাকে

অধ্যাপক, এ.বি.এন শীল কলেজ, কুচবিহার

প্রসঙ্গ : যৌনসংখ্যালঘু | নীলাদ্রি দেব

বিকৃতি-ই প্রকৃতি (বিকৃতি ঃ এবম্ প্রকৃতি ঃ)।
প্রকৃতি সৃষ্ট ঃ ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, রীতিনীতি।
প্রাকৃতিক দহনে জ্বালানি কেন নিজস্ব সৃষ্টিই ?

চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে ক্রমশ
অশ্রু নাসাদন্ড বেয়ে নেমে আসতে না আসতে
মিলিয়ে যায় বাষ্প হয়ে,
    এ যেন রোজনামচা।
জীবন যুদ্ধে সকলেই সৈনিক,
আর কিছু সংখ্যক জন্ম থেকেই আহত।
আহতদের ক্ষতস্থানের ক্ষতরস
    গড়িয়ে আসবে কি আজীবন?

আছে তীক্ষ্ণতা
আছে রেললাইন
আছে বহুতল বাড়ির ছাদ
আছে সিলিং - ওড়না
আছে ঘুমের বড়ির শিশি - ফলিডল
তবুও আছে - জীবন।

নিলাদ্রী দেব, কবি, বাচিক শিল্পী, কুচবিহার

নবরূপ | শীলা ঘটক

বাইরে বেল বাজার শব্দ

ভেতরে আসুন —

(কাঁধে ব্যাগ, জিনস আর সাদা টপ পরা এক আগন্তুকের প্রবেশ)

একটু দরকার আছে আপনার সঙ্গে,

বলুন —

আমার একটি ঘরের দরকার।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আগন্তুকের দিকে

কি দেখছেন ?

না মানে .... আপনার পরিবারে কে কে আছে ?

কেউ না আমি একা ..... আমি বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন আগে। বলতে পারেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি।

ভদ্রলোক চেয়ারটি এগিয়ে দেয় .....

আপনার নাম কি ?

আমার ? আমার নাম অর্পিতা দাস। একসময় সবাই আমাকে শুভেন্দু বলে ডাকতো।

শুভেন্দু ?

হ্যাঁ, শুভেন্দু দাস।

ঠিক আছে আপনি কাল আসুন কথা হবে, ঘুঘুমারীতে আমার একটা বাড়ী আছে, দেখি কি করা যায়।

অর্পিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে।

নানা চিন্তা ভিড় করতে থাকে অর্পিতার মনে। সমস্যার শেষ নেই — কোন বাড়িওলা বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না আমাদের। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে রাস্তা পার হয়ে গেল। পেছন থেকে একটি ছেলে সিটি দেয়, অর্পিতা পিছন ফিরে তাকাতেই ছেলেটি চোখের ইশারায় কুসিৎত ইঙ্গিত করে। না দেখি না দেখি করে অর্পিতা তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে।

শরীরটা আজ বিশেষ ভাল নয় — এক পা এক পা করে অর্পিতা তার বর্তমান ঠিকানায় ফিরে আসে, তালা খোলার আওয়াজ পেয়ে বাড়ির মালিক বারান্দা থেকে ঝুঁকে দেখে — অর্পিতার সঙ্গে চোখাচোখি হয় .....

কি ঘর খুঁজে পেলে ?

আমায় কিছু বললেন ? কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে অর্পিতা উত্তর দিল।

বলি ঘর পেলে ? বুড়ো বাড়িওলা একটু ঝাঁঝিয়ে প্রশ্ন করে।

মনের কথা গোপন রেখে অর্পিতা বলে, না মেসোমশাই এখনও পাইনি, পেলে আপনাকে জানাবো।

কিন্তু অর্পিতা, এ মাসের মধ্যেই ছাড়তে হবে কিন্তু, পাড়ার ক্লাব থেকে এসে শাসিয়ে গেছে। বলেছে, এ সব হিজড়ে - ফিজড়ে রাখা চলবে না। ওসব পাড়ায় থাকলে পাড়া নষ্ট। দেখো, আমাকে তো পাড়াতে বাস করতে হবে। আমার তো নিজের বাড়ি, আমি আমার বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাব ?

মেসোমশাই, শুধুমাত্র হিজড়েরাই পাড়া নষ্ট করে ? তথাকথিত ছেলে বা মেয়েরা বুঝি পাড়া নষ্ট করে না ?

অতো কথায় দরকার কি বাপু। তুমি মানে মানে আমার ঘর ছাড়তো —

সময়মতো নখ দাঁত বের করে বাড়িওয়ালা অর্পিতাকে শাসায়। দরজা খুলে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে অর্পিতা বিছানায় শুয়ে পড়ে। ভাবতে থাকে মা-বাবার কথা। ভাবতে ভাবতে তলিয়ে যায় অতীতে ..... অর্পিতার যখন সাত বছর বয়স, অর্পিতার মা মারা গেলেন। বাবা আবার বিয়ে করে নতুন মা নিয়ে এসে হাজির। ছোটবেলা থেকেই অর্পিতা একটু মেয়েলি ধরনের। শরীরটা ছেলেদের হলেও মনে বাস করে এক নারীসত্তা। পাড়ায় ক্রিকেট খেলা, বল খেলা এসব অর্পিতা পছন্দ করতো না। ছোটবেলায় মাকে দেখত কপালে টিপ্ পরতে ..... অর্পিতাও কপালে টিপ্ ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে ভালবাসত। নতুন মায়ের উস্কানিতে বাবাও ক্রমশ বদলে যেতে শুরু করলো। ছোটবেলা থেকেই অর্পিতা স্নান করতো গায়ে গামছা চাপা দিয়ে ..... এসব দেখে ওর নতুন মা খুব মারধোর করতো।

ছোট থেকে যেহেতু ছেলে হয়েও মেয়েদের মতো — এরজন্য স্কুলেও সে প্রিয় ছাত্র ছিল না। পড়াশোনায় খারাপ ছিল না। যেহেতু ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে অর্পিতা মিশতে পছন্দ করতো না তাই মেয়েবন্ধু বেশী ছিল। টিফিনের সময় ছেলেদের সঙ্গে না খেলে অর্পিতা মেয়েবন্ধুদের সঙ্গে ক্লাসরুমে গল্প করতো, কখনো সখনো মেয়েদের সঙ্গে মাঠে ছি-বুড়ি খেলত। এই মেয়েলিপনার জন্য অর্পিতা কোনদিন শিক্ষকদের কাছে প্রিয়ছাত্র হয়ে উঠতে পারেনি। দিদিমণি, মাস্টারমশাই — সবাই ওকে নিয়ে হাসাহাসি করত। ক্লাস ফাইভ থেকে টেন এই সময়টা ওকে খুব নির্মম অপমান সইতে হয়েছে। কিন্তু সবটাই মানুষের জীবনে খারাপ লাগা হতে পারে না। অনেক খারাপের মধ্যেও ভাললাগা কিছু থাকে .... কিছু ভালো মানুষ থাকেন বলেই হয়ত মানুষ বেঁচে থাকার রসদ পায়। মঞ্জু দিদিমণি আর বনশ্রী দিদিমণি দুজনে অর্পিতাকে খুব স্নেহ করতেন। একদিন একটি ছেলে অর্পিতাকে লেডিস বলেছিল। সাথে সাথে ওই দিদিমণি ওই ছেলেটিকে এবং অর্পিতাকে ডেকে নিয়ে ব্ল্যাক বোর্ডের সামনে দাঁড় করিয়ে বলেছিল, শুভেন্দু লেডিস তুই জানলি কি করে ? শুভেন্দু কি তোকে প্যান্ট খুলে দেখিয়েছে যে ও মেয়ে না ছেলে ? তুই আগে সবার সামনে দেখা তুই ছেলে না মেয়ে তারপর শুভেন্দু দেখাবে ও ছেলে না মেয়ে ..... সেই দিনের পর থেকে ছেলেটা শুভেন্দুকে আর কোনোদিন বিরক্ত করেনি। যতদিন শুভেন্দু ওই স্কুলে ছিল ওই দুইজন দিদিমণি ওকে আগলে আগলে রাখত। সে প্রায় বারো বছর আগের ঘটনা। অতীতের নানা স্মৃতি অর্পিতার মনে ভর করতে থাকে। আজও অনেক মানুষ অনেক কথা বলে, অর্পিতা কখনো প্রতিবাদ করে, কখনো করে না।

একদিন অর্পিতার বাবা ওকে ডেকে বলল, তোর এখানে থাকা চলবে না তুই আমার একমাত্র ছেলে, মেয়েদের মতো করে থাকতে চাস — এতে আমার সম্মান হানি হয়।

তাতে কি হয়েছে বাবা ছেলে বা মেয়ে — এতে কি আসে যায়। আমি তো কারোর ক্ষতি করি না। — অর্পিতা উত্তর দেয়।

লাভক্ষতির কথা নয় ... সমাজে আমার সম্মান নষ্ট হচ্ছে।

শুভেন্দু যখন সেভেনে পড়তো তখন ওর এক নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়। শুভেন্দুর প্রথম ভালোবাসা তাকেই বলা যায়। যদিও ছেলেটি তাকে কোনদিনই ভালোবাসেনি। এর পর আরও দু/এক জনের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল কিন্তু ভালোবাসার কাঙাল অর্পিতা বার বার ঠকতে থাকে।

প্রায় শূন্য হাতে শুভেন্দু বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে শিলিগুড়ির এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ওঠে। মানস বাংলা নামে একটি NGO তে অর্পিতাকে কাজ করার সুযোগ করে দেয়। এর পর ২০০৯ সালে অর্পিতা মৈত্রী সংযোগ সোসাইটি নামে একটি গোষ্ঠী ভিত্তিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়।

বিছানা ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে অর্পিতা রান্নাঘরে গেল। গ্যাসে ভাত বসিয়ে সবজি কেটে রান্নার জোগাড় করে।

পরদিন সকালে অর্পিতা সেই ভদ্রলোকের বাড়ি যায় ... একটা ঘরের জন্য কাল এসেছিলাম, যদি ভাড়া দেন তো খুব ভাল হয়।

হ্যাঁ দেব, ঘুঘুমারীর বাড়িতে ঘর আছে, ওখানে আমরা থাকি না। এটা ভাড়া দেব ভাবছি।

দুজনে রওনা হয় ঘুঘুমারীর দিকে, পথে যেতে যেতে শুভেন্দু থেকে অর্পিতা হয়ে ওঠার কিছু ঘটনা ভদ্রলোককে বলতে থাকে।

পরের দিন সকালে আগের বাড়িওয়ালার কাছে জানালো যে বাড়ি পেয়ে গেছে। সামনের মাসের পয়লা তারিখে অর্পিতা মালপত্র নিয়ে উঠে গেল।

একতলা বাড়ির দরজার বাইরে একটা গ্রিলের গেট। গেট পেড়িয়ে অর্পিতার ঘর। শহর থেকে একটু দূরে এলাকাটা একটু নিরিবিলি, তাও একটু স্বস্তি পাওয়া গেল।

মৈত্রী সংযোগের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয় অর্পিতাকে। এছাড়া বিভিন্ন সেমিনারে যোগ দিতে কোলকাতা, শিলিগুড়ি বা বিভিন্ন জায়গাতে যেতে হয়। একা থাকা যে কি নিদারুণ কষ্ট অর্পিতা সেটা সবসময় উপলব্ধি করে। তাও কিছুটা স্বস্তি যে থাকার জন্য একটা ঘর পাওয়া গেছে ...

কিন্তু ঝঞ্ঝাট অর্পিতার পিছু ছাড়ে না। কিছুদিন যাবৎ কিছু ছেলে রাত গভীর হলেই গ্রীলে ধাক্কা মারে। দরজায় ঢিল ছোড়ে, জানলায় টোকা দেয়। ভয়ে অর্পিতার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কি করবে ভেবে পায় না। নানা রকম উৎপাত উপদ্রবের মধ্যে দিন পার হয়।

একদিন খুব ঝামেলা শুরু হল .... এই নিয়ে পাশের বাড়ির বাসিন্দা জনসমক্ষে নালিশ জানায়। অর্পিতা নাকি রাত হলেই ছেলেদের ডাকে, একেবারে উল্টো পুরান। স্বাভাবিক ভাবে এই ঘটনার পর অর্পিতাকে ঘর ছাড়তে হল।

জানিনা কবে আমরা মানবিক হবো।।।।

শীলা ঘটক, কুচবিহার নিবাসী লেখিকা

লিঙ্গায়ন বিষয়ক কিছু প্রাথমিক কথা | নন্দিনী ধর

তখন আমার বয়স নয় কি দশ। আমার মা হাতে পরে বড় ডায়ালের ঘড়ি। যেমনটি পরে আমার বাবা, কাকু, বা জেঠুরা। মাকে প্রশ্ন করি, ‘তুমি ছেলেদের ঘড়ি পর কেন?’ তো, আমার মা উত্তর দেয়, ‘ঘড়ি তো ক্লিব-লিঙ্গ। তার আবার ছেলে-মেয়ে কি?’ তো সেই শুরু। এখনও যখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের লিঙ্গায়ন নিয়ে ভাবি, এখন মা-র এই উত্তরটা মনে পড়ে। মানে, ঘড়ি, ব্যাগ, ছাতা, চটি, জুতো থেকে শুরু করে প্যান্ট, শাড়ি, স্কার্ট, সালোয়ার, চুড়িদার সবেতেই এই বিভাজন। কোনটি ছেলেদের, কোনটি মেয়েদের। অথচ সবই যদিও আদতে নিস্প্রাণ ক্লিবলিঙ্গ। ঠিক কবে থেকে, কিভাবে শুরু হল এই বস্তুজগতের লিঙ্গায়ন? যথাযথ ভাবে বলা হয়ত খুবই কঠিন। কিন্তু, এইটুকু বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে এই বস্তুজগতের যে লিঙ্গায়ন - যার মধ্যে দিয়েই, যাকে কোনো না কোনো ভাবে মেনে নিয়েই কাটে আমাদের প্রায় সবার জীবন - তা আমাদের বেচেবর্তে থাকার এক অনস্বীকার্য বাস্তবতাকে চিনতে শেখায়। একটু তলিয়ে দেখলেই আমরা বুঝব, এই যে বস্তুজগতের লিঙ্গায়ন, তা যেন আমাদের প্রত্যেকের ঘাড় ধরে দেখিয়ে, বুঝিয়ে দিতে চায় আমাদের সামাজিক জীবনে লিঙ্গায়নের শিকড় কত গভীর। একই ভাবে এও অনুধাবন করা কঠিন নয় যে এই আপাদমস্তক লিঙ্গায়নের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের সামাজিক জীবনের আরেকটি বাস্তবতা - নারী ও পুরুষের মধ্যেকার যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভাজন। যে বিভাজনকে আমরা সামাজিকভাবে মনে করি চরম, অবিচ্ছেদ্য ও অনেকাংশেই দ্বন্ধমূলক। অর্থাৎ ইংরাজিতে যাকে বলে বাইনারি।

এই লিঙ্গায়নের বোঝা ঘাড়ে নিয়েই জীবন শুরু হয় আমাদের। ডাক্তার বা নার্স ওটির দরজা খুলে ঘোষণা করেন সদ্যজাত শিশুটির লিঙ্গ - ‘ছেলে’ না ‘মেয়ে’। ব্যস, সেই শুরু। ফ্রক না হাফপ্যান্ট। টেপজামা না গেঞ্জি। নটি বয় জুতো না মেরি জেন। কালো, বাদামী আর ছাইছাই রঙের পুরুষালি মিশেল নাকি রং ঝলমল নারীত্ব। মানে, আবারও সেই একই গল্প। যে সমস্ত বস্তু প্রাণহীন, কোনো বিজ্ঞানের নিয়মেই যাদের ওপর আরোপ করা যাবে না লিঙ্গ, তারাই হয়ে ওঠে আমাদের সামাজিক লিঙ্গ পরিচিতির ধারকবাহক। এক ভাবে দেখতে গেলে, সত্যিই তো এর থেকে অসম্ভব কিছু হয় না। এর নামই তো লিঙ্গের সামাজিক নির্মাণ, সাংস্কৃতিক নির্মাণ। কিন্তু, আবার এই নির্মাণের এতই জোর যে ঠিক যেভাবে অনেক অনেক মিথ/মিথ্যাকে আমরা সহজেই নিরূপণ করে থাকি, আবর্জনার বাক্সে ছুঁড়ে ফেলে দিই, তেমনটি কিন্তু ঠিক হয় না লিঙ্গের ক্ষেত্রে।

যেমন ধরুন, বেরিয়েছি এক বান্ধবীর সাথে টুকটাক কিছু কেনাকাটা করব বলে। কেনাকাটার লিস্টে আছে আমার এক বন্ধুর জন্য একটি জামা, শার্ট। বন্ধুটি পুরুষ। দোকানে ঢুকে একটি কমলা-সবুজ চেকচেক শার্ট বাছতেই বান্ধবীটি বলেন, ‘ও মা, এ প্রিন্টটা তো একদম মেয়েদের মত। অমুক পরবে তো!’ গলা বাড়িয়ে তর্ক করি, যেমন আমার স্বভাব। ‘না, পরার কি আছে? আর, প্রিন্টের আবার ছেলে-মেয়ে কি, আঁ? তর্ক করি আর ভাবি সত্যি সত্যিই যদি আমাদের বন্ধুর পছন্দ না হয় এই তথাকথিত মেয়েলি প্রিন্ট? তাই, নিরাপদ থাকতে বেছে নিই একটি সাদা-খয়েরি গাঢ় নীল রঙের চেক জামা। এটা সামান্য ঘটনা এক দিক থেকে দেখতে গেলে। কিন্তু, এটাই যেন লিঙ্গায়নের মজা। এমনই কত আপাত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে দিয়েই যে গড়ে ওঠে আমাদের লিঙ্গবোধ, সমাজের মূলস্রোতের লিঙ্গ মতাদর্শ আসতে আসতে নিজেদের ভেতরে আত্মীকরণ করতে থাকি আমরা।

আত্মীকরণ করতে থাকি শুধু পোশাক-আশাকের বাহ্যিকরণে নয়, সমাজে কে কিভাবে বাঁচবে, কি কাজ করবে, আদৌ করবে কি করবে না, এই বাস্তবতাতেই। তাই, আমি যখন কলেজে সমাজতত্ত্ব অনার্স পড়ার সিদ্ধান্ত নিই, আমার ছোটমামা - পেশায় তিনি কলেজে অধ্যাপক - বলেন, ‘তুই পারবি সোসিওলোজি পড়তে? রাস্তায় ঘুরে ভিখিরিদের যখন ইন্টারভিউ করতে হবে পারবি? কিন্তু, বারবার কানে বেজেছে ছোটমামার কণ্ঠস্বর। ভাবতে চেষ্টা করেছি, বুঝতে চেষ্টা করেছি তার পেছনের সামাজিক-মতাদর্শগত পরিকাঠামোটিকে। একদিকে যেমনই যে গোটা কথাটির মধ্যে আছে একধরনের আমাকে বা আমার মেধাকে খাটো করে দেখা, আমি এটাও জানি যে বিষয়টা শুধু আমার মেধাকে খাটো করে দেখার বিষয় নয়। যেটা আমাকে বারবার ভাবায়, কেন আমার মামা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ভিখিরিদের ইন্টারভিউ করার বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে তুলে আনলো। তার মানে এখানে কিন্তু শুধু আমার মেধার বিষয়টি নয়, আছে শ্রেণী পরিচিতির প্রশ্ন। যেন বা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে আহত হবে আমার আপাদমস্তক মধ্যবিত্ত ‘ভদ্রসভ্য’ মুখোশ। না, ‘মেয়ে’ শব্দটি একবারও ব্যবহার করেনি আমার মামা। বলেনি, ‘তুই মেয়ে না?’ তোর ওসব করা মানায় নাকি?’ কিন্তু, উহ্য থেকেও ‘মেয়ে’ শব্দটি - মধ্যবিত্ত ঘরের ভদ্রসভ্য নারীত্বের গল্প - আপাদমস্তক ছুঁয়ে দিল আমার ছোটমামার বক্তব্য। শ্রেণীবোধের সাথে এক্ষেত্রে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল লিঙ্গবোধ। লিঙ্গায়নের এও এক চরিত্র যে তা যেন সবসময়েই হাজির হয় আমাদের কাছে, একাধিক জাটিলতাকে ঘিরে। সেখানে থাকে শ্রেণী, জাতপাত, বর্ণ, ধর্মীয় পরিচিতি। আরও কত কি।

কিন্তু, আবার এও তো ঠিক আমার মামা আমায় ভালবাসে। এও ঠিক, রাস্তাঘাট, নদীনালা, পুকুর, রেল স্টেশন, গলির মোড় - কোনটাই - মেয়ে হিসেবে ঠিক নিরাপদ নয় আমার কাছে। রাষ্ট্র-পুলিশও তো যৌন হিংসা ইত্যাদির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে জিগ্যেস করে, ভদ্রঘরের মেয়ে হয়ে কি করছিলেন বাইরে এত রাতে। তাই, খুব সরল ভাষায় বলতে গেলে যেটা দেখতে পাই তা হল, ঘর-বাহির, পরিবার-রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন সব যেন কেমন এক দেখতে শুরু করে লিঙ্গায়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শুরু করলে। কারণ, লিঙ্গায়নের দর্শনকে তো আসলে পিতৃতন্ত্র বাদ দিয়ে দেখা সম্ভব না। তাই, যৌন হিংসার ভয় দেখিয়ে এই রাষ্ট্র ও সমাজ বলে আমায়, ‘এই মাগী। ঢোক ঘরে।’ বাড়িতে পরিবার-পরিজন ভালোবেসে, ভালো-চেয়ে, আদর করে বলে, ‘থাক না তুই ঘরে, আমাদের কাছে আমাদের ছোট মেয়ে হয়ে।’ অর্থাৎ, লিঙ্গায়েনের অর্থ হয়ে দাঁড়ায়, আমার ছোট হতে থাকা, আরও ছোট, এইটুকুনি, অদৃশ্য। তাই, যা শুরু হয় জামাকাপড়, ব্যাগ-জুতোর আপাত সাধারণত্বে, নিষ্পাপতায়, তাই চলতে থাকে আরও অনেক জটিল পথে। গোটা বিষয়টিকে তাই আর অত নির্দোষ, নিস্পৃহ মনে হয় না। নিষ্পৃহ নয়, নিদোর্ষ নয়, কিন্তু বড়ই সাধারণ। আমাদের সবার চেনা ছক, মেনে নেওয়া ছক। সাধারণ, প্রাত্যহিক। যেমন হয়ে থাকে বেশিরভাগ ক্ষমতা-পরিকাঠামো। সাধারণ, প্রাত্যহিক। তাই তো এ সমস্ত ছক ডিঙ্গিয়ে বেঁচে থাকা হয়ে ওঠে এত কঠিন। আর, তাই প্রয়োজন বহুধারকমের প্রতিবাদের।

আমার মতে তাই, যে কোনো প্রগতিশীল লিঙ্গ রাজনীতির একটি বড় জায়গা হলো, আমাদের প্রাতাহিক জীবনে এই যে প্রথাগত লিঙ্গ মতাদর্শের অনুপ্রবেশ, তার বিশ্লেষণ। এবং শুধু বিশ্লেষণই নয়, লিঙ্গায়নের যে জটিল বয়ানের মধ্যেই আমরা জীবন কাটাই, মেনে নিই, মেনে নিতে বাধ্য হই, তার বিরুদ্ধে একটা পাল্টা সংস্কৃতি গড়ে তোলা। একদিকে যেমন থাকবে আমাদের অন্দোলন, যৌথ লড়াই, দাবিদাওয়া আমাদের লড়াই। সেই লড়াই বাদ দিয়ে তো কোনদিন কোনো কিছু হয়নি, হবেও না। কিন্তু, সেই লড়াইয়ের পাশাপাশি আবার থাকে ব্যক্তিগত লড়াই। পরিবারের সাথে, সম্প্রদায়ের সাথে, বন্ধুদের সাথে এমনকি নিজের সাথে। সে লড়াইয়ে কখনো আমাদের হতে হয় বেপরোয়া, দায়িত্বজ্ঞানহীন, আবার কখনো হয়ে হয় অতিমাত্রায় দায়িত্বপ্রবণ। অর্থাৎ এই লড়াইয়ের কোনো সেরকম পূর্ব নির্ধারিত পথ নেই। আমরা লড়তে লড়তেই শিখি কেমন হবে আমাদের কাঙ্খিত জীবন। কেমন হবে আমাদের পরবর্তী পথ চলা। এই যে ব্যাক্তিগত বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ ও যৌথ প্রতিবাদ - এ দুইয়েই গুরুত্ব অসীম এ লড়াইয়ে। একটিতে বাদ দিয়ে আরেকটি সম্ভব নয়। যেমন অনেকটা একটা বড় গাছকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে অর্কিড, লতাগুল্ম।

নন্দিনী ধর ছোট পত্রিকা আন্দোলনের কর্মী। বর্তমানে কর্মসূত্রে বিদেশবাসী। টুকটাক লেখালেখি আর দূরন্ত বাচালপনার বদ অভ্যাস আছে।

কবিতা

খেলা | মাধবী দাস

আর কত কাল আব্বুলিশ বলে
পৃথিবীর মোড় গুলোতে থমকে দাঁড়াই
লাইফজোন বলে কি কিছু আছে?
বংশবৃদ্ধি ছাড়াকি ভালোবাসা খেলা
যায়না? সব খেলার হারজিৎ লাগবে?
ভালোলাগা গুলো
অনন্তের অলিগলিতে

চিরকাল কি
দুধভাত খেয়ে শৈশবে থাকবে?

চিৎকার করে বলতে পারিনা
কেননা আমার হিম্মত শুধু
মনকে অ্যাভয়েড করা
নইলে কেবল নারী পুরুষ নিয়ে
না খেলে মানুষ মানুষ খেলতাম .....

মুখোশ পরা সংসারটা ভরে যেত
সততার কিচির মিচির আর
অজস্র প্রপাতে।

মাধবী দাস (সহ শিক্ষিকা)

তুমি আছ আমি আছি

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

‘হলদে গোলাপ’ পড়ছি। মধ্যে পথে। এখনও শেষ করতে পারিনি। আসলে পড়া লেখা দুটোকে সামলাতে পারছিনা। কিন্তু সবটুকু আমাকে পড়ে নিতে হচ্ছে। পড়ছি রান্না করতে করতে, গানে গানে, অথবা স্কুলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অভিজ্ঞতা বাড়াতে বাড়াতে। আগে ছিলাম আদ্যন্ত দিদিমণি,এখন ম্যানেজার। কতবার বদল হচ্ছি। বদলের গল্প পড়ছি স্বপ্নময়দার লেখায়। আমরা বদল হই, মানুষ বদল হয়। আসলে মনে হয় ‘বদলে গেলাম’ কিন্তু বদল কি হয় সত্যি সত্যি। না কি হওয়া যায়?

আসলে আমাদের মেয়েদের বদল হতে হয়। আর যারা নিজেদের মেয়ে ভাবতে ভালোবাসে, মেয়েলী আচরণের জন্য বিদ্রুপের শিকার হয় যেখানে সেখানে, বাড়ীতে, কর্মক্ষেত্রে, রাস্তাঘাটে সর্বত্র তারাও চেষ্টা করে বেসিক নেচার বদলে ফেলে, নিজস্ব জগৎ তৈরি করতে। বহুবছ র মানুষের বিভাগ নিয়ে শুধুই জেনেছি পুরুষ/মহিলা দুটোই শ্রেণী, সেটারই ইংরেজি ওয়ার্ড, বানান শিখেছি। ছেলেদের বিশেষ বিশেষ নাম দিয়ে চেনা যায়। মেয়েদের জন্য আলাদা। এভাবেই দেখে শুনে কাকিমা/কাকু, জেঠিমা/জেঠু, মামা/মামী ..... দাদা/বৌদি বিভাগ করতে শিখেছি। এমন কি বি.এড এ যখন ভর্তি হলাম, তখনও মেনটাল-হাইজনে হিরো ওয়ারাশিদের ব্যাপারটি জেনে নিয়েছিলাম। মিলিয়ে নিয়েছিলাম নিজেদের ছাত্রছাত্রী-জীবনের সঙ্গে। ছাত্রীদের মধ্যেই একজনকে নায়ক কল্পনা করে তিন বান্ধবীর মধ্যে টানাপোড়েন আকছার ঘটত। এটাকে ঠিক জৈবিক প্রবলেম বলা যায়নি সে সময়। কারণ, তখন আমরা কো-এড ক্লাস করতাম না। কাছাকাছি মেয়েরাই ভীষণ ভালো বন্ধু আবার প্রিয়বন্ধুকেই এক অন্যচোখে দেখতে দেখতে অনেকেই আঁকড়ে রাখতে চাইত। হয়তো বা বিয়ের আগে পর্যন্ত দশজনের মধ্যে দুজন শারীরিক ভাবেও তৃপ্তি অনুভব করেছে, দুজন বান্ধবী বা দুজন বন্ধু মেলামেশা করে করে। এদের সমকামী বলব কিনা জানিনা। আমাদের বাড়ির অতি সচেতন ও কনজারভেটিভ মাইন্ডের জন্য আমি বা আমার বাড়ীর অন্য ভাইবোনেরা ভীষণ ভাবে আপন করে নিয়ে কোন বন্ধু বা বান্ধবীর সঙ্গে খোলাখুলি, রাত্রিদিন মেলামেশা খেলাধূলো করতে পারতাম না। বাইরের গতিবিধি ছিল সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত। তাই দুজন বান্ধবী বা একাধিক বান্ধবীর একে অন্যের সঙ্গে অস্বাভাবিক আচরণ বন্ধুত্বের বাইরের, দেখে অবাক হতাম। ভীষণ বিস্মিত হতাম। এসব আলোচনাও অপরাধমূলক মনে হত।

কলেজে যখন ভর্তি হলাম, কলেজ হোস্টেলের সুপারের সম্পর্কে বন্ধুরা প্রায়ই বলত, ‘সাবধান ... সুপার কিন্তু ‘হোমো’। ওরে বাবা, সামনে যাওয়া নিষেধ। এড়িয়ে যেত সকলেই। স্নাতকোত্তরে ভর্তি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছু বান্ধবীর মধ্যে এ আচরণ লক্ষ্য করে ওঁত পেতে শিকার ধরছে বলে মনে হত। এড়িয়ে চলেছি খুব সাবধানে। তারপর প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে। ট্রেনে যাতায়াত বা দূর পাল্লায় বেড়াতে যাওয়ার রাস্তায় অদ্ভূত দর্শন না ছেলে না মেয়ে টাইপ মানুষ দেখে। কিন্তু কোন আলোচনা নয়। কিছু কিছু পত্রপত্রিকা বইপত্র পড়া ছাড়া। মনে মনে নানা অনুমান করে নেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারিনি। এরই মধ্যে সময়ের স্রোতে নানারকম পরিস্থিতিতে নানা ঘটনায় কতবার ট্রেন যাপন আর রকমারী লোকের সঙ্গে কথা ওদের দেখে সিঁটিয়ে যাওয়া আমার ছোট্টছেলে, মেয়ের অবাক চোখে অদ্ভূত মানুষদের দেখে নানা জিজ্ঞাসা .... আমি নিরুত্তর। কারণ, নিজেই তো সব প্রশ্নের উত্তর জানিনা। ভাসা ভাসা ধোঁয়াসা সব। মনে মনে ততক্ষণে জীবনের নানা টানাপোড়েনে কত যে প্রশ্ন কথা নামা ওঠা করে। আমি কে, কেন এ জীবন এসব প্রশ্নও মাথার ভেতর ঘোরে। ‘কৈশোর থেকে যৌবন বহু সংস্কার কাটিয়ে উঠতে উঠতে কখন মানসিক একাকীত্ব এল, কবে শিরদাঁড়া অনমনীয় হতে হতে ছেলে কি মেয়ে, পুরুষ না নারী সব সীমা অতিক্রমকরে গেল কে বলতে পারে!

আমিও কি সে উত্তর জানি, জানলেও কি বলতে আছে! সংসারের কাছে জবাবদিহি করতে হবে তাহলে বারবার। এখন কিছুটা কর্তব্য আর নিজেই আমি ভীড়ের ভেতরেও একা ‘হয়েছি আলাদা’। পারস্পরিক সম্পর্ক রক্তের না অনাত্মীয়ের সে সব বিচারও আজকাল প্রায় করিনা। বাড়ীর লোক অত্যন্ত বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে তাকায়, মাঝে মাঝে বলেই ফেলে, ‘তোমার মত এক পিস’ই হয়’। আসলে এটা প্রশংসার্থে ভাববেন না বন্ধুরা। অত্যন্ত স্বার্থপরতায় নিজেকে ভালোবেসে ওদের সব সাধ সাধ্য অনুযায়ী মিটিয়েও যদি আপনার নিজস্ব টেবিল চেয়ারে একটু একা হতে চান তাতেও আপত্তি। তাই যখন ওদের দেখি, সুমিকে দেখি, অনিন্দ্যকে দেখি, রঞ্জনা, অপর্ণা, সপ্তর্ষী, শিবম, সৌপল ওদের যুদ্ধগুলো দেখি, আর সৌগতকে কাছে ভাইরে মত পাই তখন আর আমাকে মানুষ হিসেবে একা মনে হয় না আর। সত্যিকারের রূপান্তরকামীর যন্ত্রনা ঋতুপর্ণ ঘোষ আমাদের দেখিয়ে গেছেন। অদ্ভূত তার চলচ্চিত্রায়ণ। চোখ খুলছে খুব ধীরে। ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, তবু যেন মেনে নিতে চায়নি। চায়না ডাক্তারী ব্যাখ্যান। অবজ্ঞা, উপেক্ষা, টিটকারী, বিদ্রুপ, মেয়েলী তক্‌মা নিয়ে ওরা ঘুরে বেড়ায়। আজও। ‘হলদে গোলাপ’ প্রকাশের, পুরস্কৃত হওয়ার পরেও।

ঠিক এইরকম এক দ্বান্বিকতায়, নানাভাবে বেড়ে ওঠা প্রশ্নগুলো মনের ভিতর চাপা দিয়ে রাখতে রাখতেই কেটে গিয়েছিল বেশ কয়েকবছর। তারপর আমার ঘরের পাশের ব্লুআই-এর ধবধবে সুন্দুর ছেলেটাকে দেখলাম স্কুল ড্রেসে সরকারী বয়েজ স্কুলে যেতে। ভারী মিষ্টি সুন্দর, অপূর্ব ও নৃত্যশৈলী। কত্থক, ভরত নাট্যম শেখে। তারপর অনেকদিন দেখিনি। আমার স্কুলে বহুবছর পর একবার এলো তখন সে অনেক বড়। মাঝখানে ও চলে গিয়েছিল গুরু কেলুচরণের কাছে উড়িষ্যায় কটকে। এখন নিজস্ব জগতে নিজেকে মেলাতে চেষ্টা করছে, নিজেকে চিনতে চাইছে। কোন একটা NGO র তরফে স্কুলে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল ও। জলপাইগুড়ির দায়িত্বে রয়েছেন। সাহায্য করেছিলাম, যতটা পারি। তারপর আবার। ২০০৬ কি ২০০৭ সাল। ও এল ওর ‘পরিবর্তন’ সংস্থার শুভ উদ্বোধনে নিমন্ত্রন করতে। আমি কার্ড নিলাম। যাব কথা দিলাম। ও ফিরে গেল।

কখনও কার্ড খুলিনি। সময় করে গভীর রাতে খুলেছি। কৈল্পিক ছোঁয়ায় পরিপূর্ণ। কিন্তু চমকে গেছি। ওদের সেই অনুষ্ঠান গৃহ খুঁজে খুঁজে চলে গেলাম। মফস্‌সল শহরের বুকে কেরানী পাড়ায় একটি দ্বিতল বাড়ীর একতলায় সমবেত হয়েছে একদল অন্যপুরুষ, অন্যমানুষ, একদল ‘আমরা’র ভীড়। তখন সেখানে চলছে টিভির বিশেষ চ্যানেলের এক অনুষ্ঠানের ঝলক। সেখানে ‘ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানীর’ নায়ক ঋতুপর্ণ ঘোষ, যিনি নিজেকে ‘অ্যাফিমিষ্ট’ বলে গর্বিত হতেন। মীরকে কথার ছোবলে তাঁর আক্রমনের ছবি দেখলাম। রাগ হল, দুঃখও। জানিনা কেন। আসলে বাদশা নামের ছেলেটাকে ততদিনে অসম্ভব ভালোবেসেছি। স্নেহ করেছি। ঐ প্রথম সেই অন্যরকম একদল মানুষের পাশে ওকে দেখে নিজেকে, নিজের মনকে খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না।

কেমন দুঃখবোধ মজ্জায় রক্তে জাড়িয়ে যাচ্ছিল।

তারপর কখন, কবে থেকে ওর সঙ্গে, ওদের সঙ্গে, একাকার হয়ে গেলাম জানিনা। একসঙ্গে, ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘চিত্রাঙ্গদা’ চলচ্চিত্রায়ণের আগেই আমরা রবীন্দ্রবীথির হয়ে শিশির মঞ্চে কলকাতায় চিত্রাঙ্গদার সাদরী অনুবাদ মঞ্চস্থ করলাম। সহযোগিতায় কলকাতার বহু ট্রান্সজেন্ডার বন্ধুরা। বাদশার বন্ধু সব। কলকাতার সেই অন্যরকম মানুষের দল কি সুন্দর করে ফুল সজ্জায় শিশির মঞ্চের প্রবেশ পথ ফুলের জলসায় সাজিয়ে ছিল, লোক সংস্কৃতি আঙ্গিকও ছিল তাতে। আমি মুগ্ধ, বিস্মত। তারপর বাদশার সঙ্গে ওর ছাত্রছাত্রী আমার ছাত্রছাত্রী সম্মিলিত প্রয়াসে সাদরী ভাষায় (চা-বনবস্তীর শ্রমিকদের ভাষা) ‘চন্ডালিকা’ মঞ্চস্থ হল। একের পর এক আমরা স্বপ্ন দেখি। কতদূর এগোবো - কতটা যাওয়া যায় .... সীমাবদ্ধতা তো আছেই। তাই অন্যমানুষ, নাম না দিয়ে ‘মনের মানুষ’ নামে রূপান্তরকামীর বিষয় নিয়ে এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম। ‘আজকাল’ পত্রিকায় সে প্রবন্ধ প্রকাশও পায় ২০১০ সালে। সে সময় এমন এক লেখা আজকালের ‘উত্তরণ’ প্রকাশ করে অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিল। আর আমারও খানিকটা উত্তরণ ঘটেছিল আর সেই দোতলাবাড়ীর একতলায় পরিবর্তনের ঘর বা অফিস সাজিয়ে তুললেও প্রতিবেশীরা ওদের বেশীদিন থিতু হতে দেয়নি।

অনেকদিন পর ‘হলদে গোলাপ’ যখন প্রতিদিন, ‘ছুটির রোববার বেরোছিল, মন দিয়ে পড়িনি। এখন একসঙ্গে ৫৯১ পৃষ্ঠার এ বইটি পড়তে পড়তে স্বপ্নময়দাকে কুর্নিশ না জানিয়ে পারছিনা। ‘হলদে গোলাপ’ পড়ার পর আর কথা হবে না। হাত বাড়িয়ে দিয়েছি মানবতার দিকে। যেখানে চলেনা যুক্তি তর্ক কোন গপ্পো। মনের তাগিদে ওরা মিলে যায় বৃহৎ ক্ষেত্রে। সে মানুষের মন আছে, মানুষের সমস্ত ধর্ম আছে। ‘শিল্পী সত্তা আছে, পরের জন্য দুঃখবোধ আছে। সমাজ সচেতনতা আছে। আবার হিংসা পরশ্রীকাতরতাও আছে। শুধু গোলাপের স্বাভাবিক রঙ যেমন গোলাপী সেটা না হয়েও সে রঙ যদি হয় ‘হলদে’, কিংবা ‘কালো’ - তাহলে কি ফুলটাই বদলে যায়? ওরা ঠিক তেমনি। শুধু ব্যাক্তিগত যৌনতার ক্ষেত্রে ওরা এক এক জন এক এক রকম। ওদের ক্ষেত্রে পৃথক।

এসো মুক্ত করি সব বাধা সমস্ত সত্তাকে উন্মুখ করি, উচ্চারণ কবি ‘জয় হোক মানবের, ঐ নবজাতকের ঐ চির জীবিতের।”

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষিকা (ভারপ্রাপ্ত), সুনীতি একাডেমী, কুচবিহার। কবি/সাহিত্যিক/শিল্পী প্রায় পনেরটি প্রকাশিত বইয়ের সম্পাদক, নীরোজ কোরক সম্পাদক, সাংস্কৃতিক সংগঠন- রবীন্দ্রবীথি।

আমার এই পথ চলতেই আনন্দ | সৌগত মুখার্জী

জন্ম থেকেই দেখে আসছি অভাব। স্বভাবের অভাব। বাবা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্মী ছিলেন। একান্নবর্তী পরিবার। এক তরকারী ডাল-ভাত। বড়োজোড় দুপিস মাংস কিম্বা একটা ডিম সুতো দিয়ে কাটা বা একটি সবচেয়ে বাজে মাছের পিস। ভায়ে-ভায়ে দাঙ্গা লেগেই আছে। সিনেমার আলোচনা আর ফ্যাশন ছাড়া পড়াশুনোর এক্কেবারে পরিবেশ নেই। ‘মা’ ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে এসেছেন। বাবা মা-এর চেয়ে ১৩ বছরের বড়। ২১ জনের সংসারের চাপে তারপর ৫টা সন্তান। দুজন তারমধ্যে মৃত। জন্মের সময়ই দুই পুত্র সন্তান মা-এর মৃত জন্মায়। শরীরে পুষ্টিকর খাবার জুটতো না। বাবা কিষানগঞ্জ, হলদিবাড়ি, শিলিগুড়ি ব্যাঙ্কের চাপে জর্জরিত। খাওয়ার পর খাওয়ার মেনু তৈরী - এই ছিল দিনলিপি। ছোটদির বিয়ের পর হাড়ি আলাদা হল বটে, কিন্তু বাবা রিটায়ারের একটু আগে হোমলোন নিলেন। তারমধ্যে ছোটদির বিয়ে হয়েছে। আমার পড়াশুনার খরচ। তখনও ডাল, ভাত, আলুচচ্চরী। ১৯৯২তে মাধ্যমিক দিয়ে কলকাতায় দিদির শ্বশুরবাড়ী গেলাম। ২০০৪ অবধি দিদির বাড়ী থেকে পড়াশুনা চাকরী। তখনও আশ্রিত হয়ে অভাব পদে পদে। বাবা রিটায়ার করে আমার সব খরচ পাঠাচ্ছিলেন, ছোটদি ‘ড্রাগ এডিক্টেট। তাঁকে টাকা পাঠাচ্ছিলেন। ছোটজামাইবাবুর বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ছোটদি, বড়দি দুই জা ওভারল্যাপ করছে সারাক্ষণ। আর আমি স্যান্ডউচের আলু, বৃদ্ধ মা-বাবাকে দেখবো বলে রঙ্গকর্মী চাকরী ছেড়ে ২০০৪ সালে বাড়ি ফিরলাম। মানস বাংলা তৈরী করলাম শিলিগুড়িতে। দীপ পুরকায়স্থের কথায় কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এবং দার্জ্জিলিং শহরে গ্রুপ তৈরী করলাম। সকাল সাড়ে আটটায় বেরোতাম - রাতে ফিরতে ফিরতে ১১টা। যা রোজগার করলাম সব ছোটদির ট্রিটমেন্টের পেছনে চলে গেল। মা-বাবাকে কিছু বলিনি, খামকা চিন্তা করবেন। ২০০৯ সালে ছোটদি মারা গেল। দুবছর শোক পালন করেছি। নাচতে ইচ্ছেই করতো না। তখন ইন্দিরা মাসী, মণিদীপাদি, অযুক্তা খুব মানসিক সাহায্য করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবা শোক সামলানো আমার পক্ষে খুব সহজ ছিল না। ২০০৯ সালেই জলপাইগুড়িতে ‘পরিবর্তন’ তৈরী করলো অনিন্দ্য। ২০১৩ অবধি অনিন্দ্যর কথা ছিল আমার বেদবাক্য। অনেক শিখেছি কিন্তু আমার বিষয় ‘নাচ ও মানসিক স্বাস্থ্য’ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। বাবা ২০১৩ সালের ১৯শে মে মারা গেলেন, তার ঠিক দশদিন পর ঋতুপর্ণ ঘোষ। মা চলে গেছিলেন দিদির বাড়ী ও মামার বাড়ী বেড়াতে। সেই সুযোগে আমি “ রীনা স্টাডি গ্রুপ ফর ড্যান্স” -এর জন্য অনেক টাকা খরচ করলাম। কিছু বলিনি মাকে। পাপবোধ হতো। কিন্তু ২০০৫ সাল থেকে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে নাচের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটিকে শিক্ষিত করে তোলার কাজটা আমার একার পক্ষে সহজ ছিল না। বেশীরভাগ মানুষই বন্ধু সেজে শত্রুতা করেছেন। জানি বিশ্বাস করলে ঠকবো, কিন্তু মানুষ বিশ্বাস না করে জঙ্গলে, পাহাড়ে বাস করতে পারছিনা। নিজেকে ঠান্ডা রাখার জন্য যাদবপুর ইউনিভার্সিটির এক্সটারনাল অধ্যাপক সুমিত দত্ত ও অদিতিদির কাছে সাইকোলজি পড়া শুরু করলাম। সঙ্গে অলোকানন্দা রায় তার কয়েদীদের ডান্স থেরাপির সুযোগ দিলেন। টাকা রোজগার করতাম না ঠিকই কিন্তু অনেক শিখেছি ওনাদের কাছ থেকে। আমার সামনে যারা (ট্রান্সজেন্ডাররা) বড়ো হয়েছে যেমন বাবাই, বিউটি, ভব, সপ্তর্ষি, গোপাল, শিবম, আকাশ, গোপাল, জিৎ,তাপস সব্বার কাছে আজকালকার হালচাল শেখার চেষ্টা করেছি। সঙ্গে ছিল ঋতুপর্ণ ঘোষের সমস্ত চলচ্চিত্রর প্রভাব। সকলে বলতেন আমি ঋতুপর্ণকে নকল করি। শুনে হাসি পেতো। দুজনের কাজ করার মাধ্যমই তো আলাদা। ওনার ছবি তৈরী আর আমার নাচ করা দুটো কি করে মানুষ ‘এক’ করতেন তা ভেবে হাসতাম। এভাবেই বলছি আজ অবধি। আমি বোকা দর্শক হয়েই বাঁচতে চাই। আমার কাজ জীবনটা আনন্দের-শান্তির। হাসতে হাসতে কাটাতে চাই জীবটাকে। জটিলতা আমার পছন্দ নয়। ১৯৯৯ সালে বিলেত ভ্রমণ আমাকে শিখিয়েছিল সরলতা, আনন্দ। স্বচ্ছতার প্রকাশ যে নিজের মন আলোকিত হয়। সেটা বুঝতে আমার বেশীদিন লাগেনি। আমি সবজান্তা, জেঠু হয়ে বাঁচতে চাইনা। শুধু নিজের ও নিজের বিষয় ‘নাচ ও মানসিক স্বাস্থ্য’ নিয়ে পড়াশুনা করতে চাই এবং কাজ করে যেতে চাই। জানি একাই বাঁচতে হবে। সাবান দিয়ে পায়ের নোংরা পরিস্কার করার মতো যৌনতার স্থলন করি। যাতে অন্যের ক্ষতি না হয় সেটাও মাথায় রাখতে হয়। বন্ধুদের কাছে সাংবিধানিক মতামত সবসময় নিয়ে থাকি। আসলে তো জীবনটা শাঁখের করাতের মতন। তার মধ্যেও নিজের যেটুকু আছে সেটুকুতো শান্তিতে থাকি আমি। জানি সেটাই ঐশ্বর্য্য। এই মুহূর্তে ডি এমের সঙ্গে দেখা করে, এস.পি ও এস.ডি.ও অফিসে যাব। কবিগুরুর হাত ধরেই পথ চলব। সামনে অনেক কাজ। শুধু আমার ঈশ্বর এবং আমি। তুমি আর আমার মাঝে কেউ-ই বাঁধা নয়। বাবা বলেছিলেন ভালো রেজাল্ট করলে কলকাতা পাঠাবেন। ১৯৮৯ সালে প্রথম সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর নাচ দেখি ‘শ্রীদয়ালে” ওড়িসির সাথে সেই প্রথম আলাপ। জলপাইগুড়ি কলামন্ডলমে প্রথম দু বছর ওড়িসির একটা ধারণা হয়। তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ তথ্য আধিকারীকের ওয়ার্কশপে মানালিশ ঘোষের নাচের ক্লাস করি। কিন্তু তখন আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা। সমস্ত শিক্ষকমহাশয়রা রেগে গেছেন। আমি পড়া ফেলে নাচছি বলে। ১৯৯২ সালে মাধ্যমিক পাশ করেই প্রায় পালিয়ে চলে গেলাম কোলকাতা। আর্টসের ছাত্র ভর্ত্তি হলাম সায়েন্স নিয়ে বাংলা মিডিয়াম থেকে ইংরাজী মিডিয়াম। স্কুল থেকে কলেজে। থাকতাম নিজের বাড়িতে। ভর্ত্তি হোলাম দিদির শ্বশুরবাড়িতে। ১৯৯৪ সালে ডঃ শৈবাল বসুর একটি উপস্থাপনায় কাহিনী (শ্যামা অবলম্বনে) করার জন্য উচ্চমাধ্যমিক দিলাম না। পরের বছর পি ডিভিশানে পাশ করলাম। তখন পুরো মাত্রায় নেচে চলেছি কলকাতায়। সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে পিস্‌তুতো এবং জেঠতুতো দাদার কাছে যৌনতার ক্লাসের হাতেখড়ি। ক্লাস নাইনে থাকতে আনন্দবাজারে সমকামিতা নিয়ে চিঠি লেখা শুরু করলাম। কলকাতায় যাওয়ার পর ডাক্তার দুই জামাইবাবুর কাছে নিজের যৌনতার আত্মসমর্পন করলাম। ছোটবেলা থেকে মা সাইকিয়াট্রিষ্ট -এর কাছে যেতেন বলে সেটা আলাদা করে চাপের কিছু ছিলনা। ১৯৯৮ সালে অনিন্দ্য, অগ্নিভ, ইন্দ্রনীল, দীপ, ঋক্, শৌভিক সবাই মিলে শুরু করলাম ‘প্রত্যয় জেন্ডার ট্রাস্ট’। লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে কাজ করার বুদ্ধিটা প্রথম মাথায় আসে অনিন্দ্য এবং দীপের। রাজার যৌনকক্ষে প্রতি মঙ্গলবার আমরা বসতাম। সঙ্গে নাচ ছিল আমার শক্তি। নিজের রোজগারের ধান্দায় ব্যস্ত হয়ে পরলাম। প্রথম চাকুরী এড়ুকেয়ার ২০০১ সালে - ১২০০ টাকা মাইনে তার সঙ্গে যাতায়াত, থাকা-খাওয়া। উষা গাঙ্গুলী নিয়ে গেলেন ‘রঙ্গকর্মী’তে। ৩০০০ টাকা মাইনে সঙ্গে যাতায়াত থাকা খাওয়া। সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছি নেচে। সঙ্গে আছে যৌনতার অধিকারের লড়াই। ফিরতে হল জলপাইগুড়ি মানস বাংলা তৈরী করতে। বোর্ড মেম্বাররা বললেন সম্পূর্ণ উত্তরবঙ্গের দায়িত্ব আমার। শুরু করলাম জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও কোচবিহার নিয়ে। তখনও কোন সাপোর্ট গ্রুপ ছিল না এখানে। চ্যালেঞ্জটা শাস্তি হয়ে গায়ে মাখলাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমার নিজের কতি বন্ধুরা সাড়া দিলেন। ২০০৯ সালে মানস বাংলার চাকরী ছেড়ে প্রত্যয় - সংহিতার চাকরী নিলাম। সোমা সেনগুপ্ত ও অনিন্দ্য হাজরা বোঝালো মানুষের অধিকার কাকে বলে।’ যৌনতার অধিকারের লড়াই লড়তে লড়তে অক্সিজেন জুগিয়েছে নাচ। কলকাতা, উড়িষ্যা, বম্বে, দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর সবই করছি চাকরীর সাথে। ২০১৩ সালে বাবা মারা যাওয়ার ঠিক দশ দিন পরে গেলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। শুরু হোলো ২০০৫ সালে খোলা নিজের সংস্থা ‘রীনা’ স্টাডি গ্রুপ ফর ড্যান্স’-এর যাত্রা। অনিন্দ্যরই দেওয়া নাম। এক বছর প্রায় অনেক টাকা খরচ করে ‘ঋতুপর্ণ রেট্রোস্পেক্টিভ’ ২০১৩-১৪ করলাম। ইতিমধ্যে কিছু কতিরাও নাচের আনন্দে যোগ দিল। একটু জোর পেলাম। কত বাধা এসেছে, আরো কত আসবে। হাসিমুখে পেরিয়েছি - আরো পেরোবো। তবে মা পাশে না থাকলে পারতাম না। মা-বাবা যা করেছেন আমার জন্য তা না লেখাই ভালো তাহলে কোনো বইতে আমার লেখার ঠাঁই হবে না। বিউটি, বাবাই আর ভবকে দেখলে আমার নিজেকে ‘মা’ মনে হয় এটুকু বলতে পারি।

মা ছোটবেলা থেকেই আমাকে সাইকিয়াট্রিষ্ট দেখান। বোধ করি মা-এর স্কিৎজোফেনিয়া আছে। সুমিতদা, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক (সাইকোলজি) বলেন আমারও জেনেটিক্যাল স্কিৎজোফেনিয়া আছে। অদিতিদি, (শিবপুর সন্তোদাশবাবাজীর নিম্বকি সম্প্রদায়ের আশ্রমের কাছে বাড়ী) মাঝে মাঝেই যাই মন পরিস্কার করতে। পাঁচ বছর বয়স থেকে পুরুষতন্ত্রের হিসাবে মেয়েলি সমকামী আমি। আমার কোন রকম রোগ হওয়া অস্বাভাবিক নয় বলে আমার মনে হয়। প্রতিটি রোগেরই একটি বিজ্ঞানসম্মত কারণ থাকে। খুব জর্দা পান এবং গুট্‌কা খাই। মাঝে মাঝে মদ খেতেও ভালোবাসি। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি মা-এর হাইপার এ্যাঙ্গজাইটি ও টেনসান আছে। সঙ্গে বিরক্ত করার ইচ্ছে। একসময় সব ছেড়ে ছুড়ে কলকাতা চলে গেছিলাম। কিন্তু প্রতিদিন মা-বাবার প্রতি কর্ত্তব্য না করলে নিজের পাপবোধ হোতো। ওনারা যা করেছেন তা কেউ করেনি। বিশেষ করে ন-মাস পেটে ধরা, জন্ম দেওয়া, লালনপালন করা। আরও কত কি। সঞ্জয় সেন, সাইকিয়াট্রিষ্ট আমাকে দেখে বলেছিলেন ‘যা ইচ্ছে তাই করবে’। আমি তাই করার চেষ্টা করি। কিন্তু পরিস্থিতি বাধা দেয় মাঝে মাঝে। অনেলজোলাম, প্রেসারের ওযুধ জোড় অ্যাপিলক ছাড়া এখন আর কোন ওষুধই খাই না।

এই মুহূর্তে আনন্দম হাই স্কুলে বসে আছি। ভব, সমীর, আবদুল নাচবে - আজকে এবং পরশু স্কুলের হয়ে। কিভাবে যে ভাসতে ভাসতে এখানে এলাম জানি না। এত সম্মান কি প্রাপ্য ছিল? বরাবরই তো একা থেকেছি। কারুর সাথে থাকতে পারি না আমি।

মানসিক রোগ নিয়ে আর ভাবিনা। শরীরের মধ্যেই তো মন। শরীর খারাপটা আনতে পারি তাহলে মনের রোগটা মানব না কেন!!! সমস্যাটা আসলে সামাজিক। প্রকৃতি ও পরিবেশই তো মানুষের মনকে চালিত করেন। তাই ঈশ্বর আরাধনাই একমাত্র প্রতিকার ও প্রতিরোধ। মানুষ যা কিছু করছেন তাতো বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। সাইকিয়াট্রিস্ট বা সাইকোলজিস্টরাও তাই। আমরা যা কিছু শিখি পরিস্থিতি শেখায়। কবিগুরুর গানে “বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি -এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি”। অন্যের জন্য ভিক্ষা ভরা থালি - এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি” অন্যের জন্য ভিক্ষা চাইতে লজ্জা কোথায়। অলকানন্দা রায় আসবেন তাই আজ ভিক্ষার ঝুলি হাতে তুললাম। ইচ্ছে হচ্ছে পুরোনো জেলা গ্রন্থাগারের বাড়িটাতে সঙ্গীত ভবন খোলার। ভারত সরকারকে এই আবেদন পাঠাবো ভাবছি। মা-ও সমান তালে নেচে যাচ্ছেন আমার সঙ্গে।

১৯৭৫ সালে জন্ম আমার । ১৯৯৮ সাল থেকে অফিসিয়ালি মেয়েলি -সমকামী” -দের আন্দোলনের কর্মী আমি। ১৯৯০ সাল থেকে একা কাজ শুরু করেছিলাম জলপাইগুড়ি টাউন থেকে। যৌনতা ও রাজনীতির কোনো পার্থক্য নেই - এটাই উপলব্ধি করেছি। আর সত্যি সত্যি একদম একা চলতে ইচ্ছে করে। মানুষ ভালোবাসি তাই আমি গৃহীসন্ন্যাস নিয়েছি। আগামীতে “ললিতভূমি” নামে একটি নৃত্যাশ্রমের শুভারম্ভ করবো। যেখানে ছেলেরা আলাদা, মেয়েরা আলাদা এবং ট্রান্সজেণ্ডারদের আলাদা আশ্রম তৈরী হবে। শান্তি থাকলে সুখ এমনিই পিছনে পিছনে আসবে” কথাটা অলোকানন্দা রায়ের। তাই “ললিতভূমি” তেই সেই সাধনা হোক, নাচে - গানে - কবিতায় - অঙ্কণে পৃথিবী নির্মল হোক্। রোগ-তাপ-জড়া-ব্যাধি দূর হোক। হানাহানি, মারামারি, অভিমান, হিংসার দূর হোক। এই কামনা এই বাসনা আমার।

সৌগত মুখাজ্জী, নৃত্যশিল্পী, জলপাইগুড়ি

অন্য - মন | নন্দিতা বর্মন

অনেক দূর থেকেই ওদের গ্রুপটাকে দেখতে পেয়েছিল তৃষা। সাত আট জনের একটা গ্রুপ। দু তিনজন পুরোন স্কুলের হলেও বাকিরা প্রত্যেকে নতুন। তৃষার একবার মনে হল আবার লাইব্রেরীতে ফিরে যায়। কিছু ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের এই ক্লাসটা এত ভাল হয় যে মিস করতে ইচ্ছে করে না। তাই অনিচ্ছাকৃত ভাবেই ক্লাসরুমের সামনে ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হল।

প্রায় ছমাস হলে চলল কলেজে ভর্তি হলেও প্রথম দুমাস তৃষা কলেজে আসেনি। তখন ও কলেজে যাওয়ার মত অবস্থায় ছিল না। মনে মনে তৃষা তখন এক হেরে যাওয়া মানুষ। খুব কাছের একজন মানুষের দূরে চলে যাওয়া ওকে রিক্ত নিঃস্ব করে তুলেছিল - জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিবর্ণ শুকনো পাতার মত।

জীবনের স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্যের ছত্র হারিয়ে গিয়ে এক সর্বগ্রাসী শূণ্যতা সবসময় ওকে ঘিরে থাকত। একজন মানুষ তৃষার জীবন থেকে সমস্থ রং সমস্থ আলো নিয়ে চলে গিয়েছিল।

হতাশার অন্ধকার ডুবে যেতে যেতে তৃষা পড়াশুনো করা, জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলা এসব কথা প্রায় ভুলতেই বসেছিল, কিন্তু তৃষা কলেজে যাওয়া শুরু করল মায়ের কিছু কথায়। যেদিন মা অনেক কান্নাকাটি করে তৃষাকে বলেছিল তৃষা যদি পড়াশুনো শেষ করে একটা চাকরির চেষ্টা না করে তাহলে সংসারে ক্ষতি হয়ে যাবে। দু'তিন বছর ধরে তৃষার বাবার রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেলে ওর ছোট ভাই আর বোনের পড়াশুনোর খরচ চালানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। একমাত্র তৃষাই পারে সংসারটাকে বাঁচাতে।

মায়ের সেদিনের কথাগুলো তৃষাকে অনেক পরিণত করেছে। তৃষা বুঝতে পেরেছে কারও জন্যে যদি তৃষার জীবন তছনছ হয়েও যায় - তার জন্যে তাদের পুরো ফ্যামিলিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না।

তৃষা কলেজে যায় ক্লাস করে ক্লাসের ফাঁকে লাইব্রেরীতে বসে পড়াশুনো করে - কলেজ শেষ হয়ে গেলে সোজা বাড়ি ফিরে আসে। কোনও কোনও দিন কলেজের আশেপাশের বুক স্টলগুলোতে গিয়ে চাকরির নতুন কোনও বিজ্ঞাপন বেরোল কিনা সে খোঁজ খবর করে। তৃষা বুঝে গেছে যেভাবেই হোক একটা চাকরি আগে তাকে জোগাড় করতেই হবে। সংসারের জন্য। তবে তৃষা সবসময় চেয়েছে নিজের মৌলিকত্ব নিয়ে যদি বুটিক খোলা যায়। তবে সে মানুষটাকে নিয়ে যার স্বপ্নের ছবি মানুষটা আজ না থাকায় ইচ্ছেটাও কেমন হারিয়ে গেছে।

কলেজে এসে নতুন করে কারও সাথে বন্ধুত্ব হওয়ার প্রশ্ন নেই। পুরোন স্কুলের যে ক'জন আছে তাদের সাথেও খুব একটা কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তৃষা এমনিতেই চাপা স্বভাবের মেয়ে। এতবড় একটা মানসিক ধাক্কা খাওয়ার পরে যেন আরও বেশী অর্ন্তমুখী হয়ে উঠেছে।

ক্লাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পাখি, কৌশিক মহুয়া অজন্তাদের দলটা ওর দিকে এগিয়ে এল। সবাই মিলে প্রায় ওকে চেপে ধরল। নবীনবরণ উৎসবে ওকে একটা কবিতা আবৃত্তি করতেই হবে। তৃষা যে ভীষণ ভাল কবিতা আবৃত্তি করে এটা কিভাবে জানি এরা সব জেনে গিয়েছে। কৌশিক তো বলেই দিল - ‘‘শুধু কলেজে এসে পড়াশুনো করব সেটি হবে না। ম্যাডাম। আমাদেরকেই একটু সময় দিতে হবে,” কোনওভাবেই ওদেরকে এড়ানোর গেল না। পাখি এগিয়ে এসে বলল, ‘‘আজ তোকে নিয়ে আমাদের বাড়ি যাব। ওখানে বসেই ঠিক করব কি করা যায়।”

প্রাণোচ্ছল পাখিকে পছন্দ না করে পারা যায় না। তৃষার পর্বত প্রমাণ নীরবতার পাশে পাখি যেন চঞ্চল ঝরণা। ওদের বাড়িতে নিজের ঘরে তৃষাকে বসিয়ে রেখে জাষ্ট দশ মিনিট সময় দে” বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনের দুপ্লেট চাউমিল আর সঙ্গে কফি নিয়ে যখন ও ঘরে ঢুকল - তৃষা মনে মনে চমকে উঠেছিল। সদ্য স্নান করা পাখিকে একটা নরম তুলতুলে প্রজাপতি মনে হচ্ছিল।

অনেকদিন পরে পাখিকে দেখে তৃষার আবার সেই ভীষণ মন কেমন করা ভাল লাগাটা ফিরে এল। এই অনুভূতি এত সুন্দর আর ব্যক্তিগত যে এটা একমাত্র তার সাথেই ভাগ করা যায় যাকে দেখে এই অনুভূতি আসে।

ওদের ক্লাসের কৌশিক অনেকদিন নানা রকম বাহানায় তৃষার সাথে বন্ধুত্ব বাড়াতে চাইছিল - কখনও কখনও কলেজ থেকে বেরিয়ে তৃষার সাথে কথা বলতে বলতে অনেকদুর হেঁটেওছে। তৃষা কথা বলেছে, আর পাঁচটা মানুষের সাথে যেভাবে বলে সেই ভাবেই । কৌশিকের চোখে এক বিশেষ প্রশ্রয়ের আহ্বান ছিল। যা তৃষাকে কোনও ভাবেই আকর্ষন করেনি। ওরা জানে না, তৃষা অন্য সব মেয়েদের মত নয়।

পাখিটা যেন কী - খাবারগুলো টেবিলে রেখেই লাফ দিয়ে বিছানায় এসে ওকে জড়িয়ে ধরে। তারপর ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে ওঠে, ‘‘তুই কী রে ! কেন এত গুটিয়ে থাকিস্ ? তোর এত সুন্দর চোখ, কী দারুণ চুল !” তারপর একটানে ক্লাচারটা খুলে ফেলে কানের দুপাশের চুলগুলো সরাতে সরাতে বলে উঠেছিল - ‘‘তুই জানিস, চুল ছেড়ে রাখলে তোকে কত সুন্দর লাগে দেখতে ! তাহলে কেন এভাবে থাকিস্ তুই ?” আর এসব কথা বলার সাথে সাথেই পাখির নরম নরম আঙ্গুলগুলো সুরের মূচ্ছর্ণার মত তৃষার শরীরে অপূর্ব এক শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল। আর এই ভালোলাগার রোমাঞ্চ প্রকাশ ফেলে পাখি যদি ভুল বোঝে, তৃষা তাই নিজেকে প্রাণপনে লুকোনার চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

ওরা দুজলে মিলে ঠিক করল যে কলেজের সোস্যাল-এ তৃষার কবিতার সাথে পাখির ড্যান্স পারফরম্যান্স হবে। তার জন্য বেশ কয়েকটা কবিতা বাছাও হল কিছু ফাইনালাইটা পরের দিন হবে এটা ঠিক হল।

পাখিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তৃষা লক্ষ্য করল গোটা আকাশ যেন থমথম করছে। সেই থমথমে মেঘ যে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে এমন তুমুলভাবে মাটিতে আছড়ে পড়বে সেটা ও ভাবতেও পারেনি। মান্থলি পি.কে. বইটা কিনতে অতটুকু সময় লেগেছিল। তৃষা বাড়ি ফিরল ভিজে যাওয়া ঝোড়ে কাকের মত।

জ্বরটা রাতেই এসেছিল - সকাল হতে হতেই রীতিমত ধূম জ্বর এসে গেল। সেই স্বরে প্রথমদিন শরীর এত খারাপ ছিল যে চিন্তা শক্তি লোপ পেয়েছিল। কিন্তু পরদিন জ্বরটা একটু কমলে তৃষা মনে মনে লজ্জা পেয়েছিল। পাখিকে দেওয়া কথা রাখতে না পারার জন্য। পরদিন কবিতা নির্বাচন করার কথা ছিল - যেখানে পর পর দুদিন তৃষা কলেজেই যেতে পারল না। মেয়েটা বোধহয় তৃষাকে ফালতু ভাবল।

দুর্বল শরীরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তৃষা জানে না, হঠাৎ কপালে একটা নরম ঠান্ডা হাত ছোঁয়ায় যখন ঘুম ভাঙ্গল চোখ মেলে পাখিকে দেখতে পেল। কি এক অদ্ভূত মায়াময় দৃষ্টিতে পাখি ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে জাগতে দেখে মিষ্টি হেসে পাখি বলে ‘শুয়ে থাক উঠতে হবে না। তোর জন্য কেন জানিনা ভীষণ মন কেমন করছিল তাই অপেক্ষা না করে তোর বাড়িতেই চলে এলাম।’ কথাগুলো যখন বলছিল তখনই তৃষার মাথায় হাত বুলিয়ে চুলে বিলি কেটে কেটে সুন্দর আদর করে দিচ্ছিল।

পাখি জানে না বর্ষা ওকে ঠিক এভাবেই আদর করত। তাদের এই প্রথা ভাঙ্গা সমন্ধটাকে দুজনে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে সে নিয়েও অনেক পরিকল্পনাও করত। কিন্তু মেয়েটা ওর কথা রাখেনি - তৃষার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্য শহরে পড়তে চলে গেছে।

কেন জানি পাখিকে দেখে আবার বর্ষার কথা মনে পড়ছে। পাখির ছোঁয়ায়, চোখের তারায় যে একই ভাষা। একজন চলে গেছে বলেই কি আর কেউ নতুন ভাবে আসবে না। অনেকদিন পরে তৃষার বাঁচতে ইচ্ছে করল -। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে তৃষা পাখিকে ধরতে চাইল।

নন্দিতা বর্মন, কুচবিহার।

সংকলন ও সম্পাদনা অরিন্দম দাস (ওরফে সুমি)
সহযোগী সম্পাদনা ও বিন্যাস অনিন্দ্য হাজরা
মুদ্রণ সহায়তা প্রত্যয় জেন্ডার ট্রাস্ট

ব্যক্তিগত বিতরণের জন্য

যোগাযোগ ৮৯২৭৩১৯৫২৯ / moitribarta@gmail.com

মৈত্রী সংযোগ সোসাইটি, কোচবিহার দ্বারা অরিন্দম দাস'এর
পক্ষ থেকে প্রকাশিত ও ইম্প্রেশন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত